পুনরুত্থান

শাশ্বত নিপ্পন

শাশ্বত নিপ্পনের গল্পের গৌরব ও মূল্য হল তা বক্তব্যকেন্দ্রিক। মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, আদর্শ ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক তাঁর প্রথাগত সাহিত্যচিন্তার গড়নটিকে স্পষ্ট করেছে। মানবিকতা তাঁর গল্পের প্রধান সুর। বিষয়বস্তু হিসেবে মানবিকতা চিরকালই আধুনিক কিন্তু প্রকরণগত দিক থেকে সেই আধুনিকতাকে কালোপযোগী করার দায় রয়েছে লেখকের। কেননা বিশ শতকে প্রকরণ, তত্ত্ব ও পদ্ধতিগত দিক থেকে সাহিত্য আগের চেয়ে অনেকটাই নতুন পথের অনুসারী। নতুন সেই পথ ধরেই চলা শুরু করেছেন মানবিক অনুভূতি সমৃদ্ধ গল্পকার শাশ্বত নিপ্পন।

'পুনরুত্থান' তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই। প্রথম গল্পসংকলনটি প্রকাশ পায় 'অনতিক্রম' নামে। বর্তমান বইয়ের প্রতিটা গল্পই বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত। এই বইয়ের গল্পগুলো আগের সংকলনের গল্পগুলোর চেয়ে নানানভাবে আলাদা। আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়ে গল্পকার শাশ্বত এখানে ধরা দিয়েছেন। তরুণ এ গল্পকার আগামীতে আমাদের আরও ঋদ্ধ করবেন, এটা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গেই বলা যায়। তাঁর সর্বময় মঙ্গল কামনা করি।

মোহা. সাইদুর রহমান
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রচ্ছদ: চারু পিন্টু

পুনরুত্থান

প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারি ২০১৪

গল্প ১

প্রকাশক | সুমাইয়া পিংকি

রাঢ়বঙ্গ প্রকাশনী | স্বপ্ননীড়, ১০১ সাগরপাড়া, রাজশাহী-৬১০০

rarbango@gmail.com | Cell : 01713337861

স্বত্ব | লেখক

প্রচ্ছদ | চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস | ডিআরএইচ কম্পিউটার

মুদ্রণ | এসআর কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, নিউমার্কেট, রাজশাহী-৬১০০

মূল্য : ২৪০ ৳

আইএসবিএন : ৯৭৮ ৯৮৪ ৩৩৭১ ২৫ ৬

PUNORUTHTHAN [The Resurrection] By Shashoto Nippon. Published by Rarbango Prokasani, Rajshahi-6100. 1st Published : February 2014 [Ekushey Book Fair]

ISBN : 978 984 3371 25 6

Price : BDTk. 240 | 5 USD

উ|ৎ|স|র্গ

নোটন, বন্ধু ও আজন্ম সহচর–
লেখার অপার প্রেরণা

সূচিপত্র

অন্ত্যজা

প্রত্যাখান

ফিরে যাবার গান

জন্মদিন ও সামান্য ভুল

বাড়ি ফেরা

অন্তহীন উপাখ্যান

সাপলুডু

চক্রব্যূহে অবয়ব

অন্ত্যজা

এ অঞ্চলে নদী বলতে এই একটিই। নাম মৌরি। নামটা অনেকটা পাহাড়ী নদীর মত। যদিও মৌরি নদী জড়িয়ে আছে পাঁচ গ্রামকে, তারপরও মৌরি পাড়ের মানুষ বলতে বুঝায় মনোহরপুর বাজার আর কামদেবপুর গ্রামের পাশ ঘেসে মৌরি যেখানে বাঁক নিয়েছে নিজস্ব ঢংঙে ঠিক তার পূর্ব পার্শে মাইল খানেক উচু জায়গায় গড়ে ওঠা বেশ্যা পল্লীটিতে যারা বসবাস করে তাদেরকে। এক সময়ের দোর্দন্ড প্রতাপ মৌরির বাঁকের মুখে কবে এই পতিতা পল্লীর জন্ম -এ নিয়ে এ অঞ্চলের কারো ভাবনা নেই। তবে পরিচিতির কমতি নেই। এই পাড়ায় দূর দুরান্ত থেকে খদ্দের আসে যন্ত্রচালিত নৌকা ভাড়া করে। সন্ধ্যায় আসে সকালে চলে যায়, আবার দুই একদিন থেকেও যায় কখনো কখনো। তাই মৌরি এখানকার মানুষের নির্ভরতার অনেকখানি। এরা মৌরি জলে স্নান সেরে পবিত্র হয়, মৌরির জলেই বাঁচে, আবার ভেসেও যায়। বর্ষার মুখে মৌরির যৌবন আসতে শুরু করে। আষাঢ়ের শুরতে মৌরির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে মনে হয় নদীটি কেমন যেন দুলছে। বৃষ্টির চাপ বাড়ার সাথে সাথে নদীও হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। পরিণত খরিস সাপের মত ফনা দোলাতে থাকে। সারা বছরের অবজ্ঞার প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। পাঁচ গ্রাম ধোয়া ঘোলা জলে ঘুর্ণি খেলতে শুরু করে। সেই ঘুর্ণিতে দূর থেকে ভেসে আসে মরা পেট ফোলা গরু, ছাগল, ঘরের টিন, ঘুমানোর চৌকি আবার মানুষের লাশ -যার চোখ খেয়েছে মাছে। পেট ফোলা লাশের উপর নিশ্চুপ বসে থাকে কাক। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মৌরির ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে থাকে। এ সময় বেশ্যা পাড়ার রোগা ডিগডিগে কালো কালো ছেলেদের সামান্যতম বেয়াদবী, দুষ্টুমি অথবা ছেলেমানুষী মৌরি সহ্য করেনা। ভেসে আসা অভিশপ্ত টিন অথবা চৌকিতে প্রলুব্ধ হয়ে বেশ্যা পাড়ার অভাবী মানুষগুলো ঘোলা জলে ঝাপ দিলেই মৌরি আবার তার জলে ঘুর্ণি তোলে। একটানে তাকে নিয়ে যায় বহুদূর। যেখানে বেশ্যাপাড়ার নিত্যদিনের হিসেব নিকেষ, হাহাকার আর বেবুশ্যেদের চিৎকার অথবা হা-হুতাশ পৌঁছেনা। এভাবে বহু প্রাণ ভেসে গেছে আজ অবধি। তবু লোভ যায়না অভাবি মানুষগুলোর। চৌকিতে শোয়ার লোভ সামলাতে পারেনা এখানকার মানুষগুলো। প্রিয়জনকে নদীর পাড়ে অপেক্ষায় রেখে

ওরা ভেসে যায় নদীর জলে। শোকের তুফান ওঠে বেশ্যাপাড়ায়। বুক চাপড়ে প্রলাপ করতে থাকে আরতি, পূর্ণিমা, রেবতিরা। সেই শোকে সংক্রামিত হয় শাবানা, অলিভিয়া, ববিতাদের মাঝেও। এ সবই নিজেদের রাখা নাম। এরা নিজে নিজেই নিজের নাম রাখে অথবা খালা দিয়ে দেয় একটা বাহারী নাম; অথবা খদ্দেরে। খদ্দেরের পছন্দ মোতাবেক বেশ্যারা কেউ হিন্দু অথবা মুসলমান হয়। মৌরির জলে যেদিন কেউ ভেসে যায় সেদিন আর হাঁড়ি চড়েনা বেশ্যাপাড়ার হেঁসেলে। পিতৃ পরিচয়হীন শিশুর শোকে নামহীন গোত্রহীন বেশ্যারা সেদিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। সবাই সেদিন একত্র হয় হরেন মাস্টারের ঘরে। হরেন মাস্টার এদের ভগবান, এদের আল্লাহ, এদের প্রাণ। পাড়ার সকলেই মাস্টারকে মান্য করে। নতুন পুরাতন সব মেয়েমানুষ তাকে পথে দেখলে পথ ছেড়ে দেয়। হরেন মাস্টারের কি জাত তা এরা জানে না- এ নিয়ে এদের মাথাব্যথাও নাই কারো। শুধু বেশ্যাগুলো জানে হরেন মাষ্টার ওদের এক ধরণের আশ্রয়। সামান্যতেই এদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। চুল ছেড়াছিড়ি ঝগড়া; খিস্তি-খেউর। খদ্দেরের ফেলে যাওয়া বাংলা বোতলের তলানিটুকু গিলে এক ঘরের মাগী অন্য ঘরের মেয়েছেলের উপর চড়াও হয়। এও ছাড়ার পাত্র নয়; একজন অন্যজনকে 'খানকি''বেশ্যা' বলে গালাগাল দেয়। বাড়াবাড়ির রূপ নিলেই গলা খেঁকরে বেরিয়ে আসে হরেন মাস্টার। গম্ভীর গলা বলে ওঠে,

- যাও, অনেক হয়েছে, এখন শান্ত হও।

জোঁকের মুখে নুনের ছিটে যেন। কুঁকড়ে যায় দু'পক্ষ। তারপর দু'জনেই ফিরে যায় দু'জনের ঘরে।

অদ্ভুত রহস্যময় এই মানুষটি। সুন্দর সুপুরুষ এই মানুষটিকে সহজেই এখানকার মানুষগুলোর মধ্য থেকে আলাদা করা যায়। বর্তমানে সে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নয়; অতীতেও ছিল কিনা জানেনা কেউ- তবু তিনি মাস্টার। এই নিষিদ্ধ পাড়ার পিতৃ পরিচয়হীন শিশুগুলোকে কলা-পাউরুটির লোভ দেখিয়ে নিজের ঘরের মেঝেতে পড়তে বসায় হরেন মাস্টার। নিজের অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে সস্তা পেনসিল, কাগজ, স্লেট আর পাউরুটি নিজের পয়সাতেই শহর থেকে কিনে আনে সে। শিশুরা দুলে দুলে সুর করে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ভুল হলে হাত পাখার লাঠি দিয়ে সেই ভুল শুধরে দেয় হরেন মাস্টার। কখনো কোন চিঠি পত্র উড়ে পাড়ায় এসে পড়লে হরেন মাস্টারই তা পড়ে দেয়। বেশ্যাদের টাকা কড়ির হিসাবও হরেন মাস্টার রাখে সারা বছর। পড়া শেষে

সব ছেলেগুলোকে কাছে বসিয়ে নিজেই খাওয়ায় হরেন মাস্টার আর বলে,
- খা, খা, খেয়ে জোয়ান হয়ে ওঠ তো দেখি তাড়াতাড়ি; মস্ত বড় বিদ্যান হবি একদিন, তখন এই মাস্টার দাদুকে একটা লজেন্স কিনে দিস। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে আদরের ফুলি তৎক্ষনাৎ জবাব দেয়,
- তখন তো তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, তোমার দাঁত পড়ে যাবে, চকলেট খাবা কি করে?
খিলখিল করে হেসে ওঠে শিশুগুলো। সে হাসিতে হরেন মাস্টারও যোগ দেয়। তখন গ্রামের ভদ্র পাড়ার মত সুন্দর হয়ে ওঠে মৌরি নদীর পাড়ের বেশ্যা পাড়াটা। সারা রাতের ধকল সহ্য করা ক্লান্ত বেশ্যাগুলো দুর থেকে এই পবিত্র দৃশ্য দেখে। তাদের সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে চকিতে একচিলতে স্বপ্ন খেলে যায়। হরেন মাস্টারের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা বাড়ে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যায় বেশি। এ পাড়ায় মেয়ে জন্মায় বেশি। আর মেয়ে জন্মালেই এ পাড়ার খালা/ মাসী খুশি হয়। বাঁচলে এরাই হবে পাড়ার লক্ষি। ছেলে হলে খুশি যে একেবারে হয় না তাও ঠিক না। ছেলে বড় হলে মাস্তান হবে। চুরি করবে; পুলিশে ধরবে; হাজত খাটবে; বের হবে আবার। এক সময় খুনের মামলায় পড়িয়ে পড়বে; অবশেষে দাগী আসামী হয়ে কোন মাগীর ঘরে লুকিয়ে চুরি করে বাংলা মদ, গাঁজা বিক্রি করবে। তারপর এক সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। জেলে যাবে বড় সময়ের জন্য অথবা ক্রসফায়ার। আর মেয়েগুলো পাড়াতেই থাকে। বড় হয়ে ওঠে কলাগাছের মত। তারপর একদিন সন্ধ্যায় গন্ধ তেলে চুল ভিজিয়ে, টাইট ব্লাউজ আর রঙিন সায়া পরে দাঁড়িয়ে থাকে তার মায়ের ঘরের সামনে। এটাই যেন নিয়ম এখানকার। এর ব্যতিক্রম নেই। শুধু ব্যতিক্রম ঘটেছিল ফুলির জন্মের সময়। শেফালী যে পোয়াতী ছিল তা পাড়ার মেয়েছেলেরা ভালো করে জানতো না। যেদিন শেফালী পাড়া কাঁপিয়ে ‘ওয়াক’ করতে লাগল, তখন সবাই তার দিকে তাকালেও তেমন গায়ে মাখলো না কেউ, ... এ দৃশ্য পাড়ায় নতুন না। তারপরও ছুটে এসেছিল খালা। এক বালতি জল এনে চোখে মুখে জলের ছিটে মেরে মমতাময়ী হয়ে বলেছিল, - প্রথম তো; এ সময় এমন হয়; চিন্তা করিসনি; মেটার্নীতে গিয়ে ঠিক করে দেব।
অন্যরা বলেছিল,

- খালা সোহাগি মাগীর ছিনালী; আবার মেটার্নী হাসপাতাল! কতই আর দেখবো লো; এখনই ছমিরন ধাইকে খবর দিলেই হয় ; হাত ভরে দিয়ে টেনে আনবে আপদ।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল উপস্থিত সবে। শুধু হাসেনি হরেন মাস্টার। উতলা হয়ে অযথা দৌড়ে বেড়িয়েছে সারা পাড়া। আর মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে শেফালীর ঘরে। আস্তে ধীরে সব অস্থিরতা থেমে আসে। শুধু স্থিরতা আসে না খালা আর শেফালীর বুকে। শেফালী দেখতে শুনতে ভাল। ভদ্র বাড়ীর মেয়েদের মত দেখায়। পাড়াতে তার দামও কিছুটা বেশী। থানার বাবুরা মাঝ রাতে এলে শেফালীকেই খোঁজে। তাই খালা তাকে লক্ষিজ্ঞান করে -আর সে কারণেই শেফালী অন্যদের চক্ষুসুল। তাই শেফালীর অবস্থা যত তাড়াতাড়ি মেটানো সম্ভব হবে ততই খালার ব্যবসার জন্য ভাল। আর এজন্যই মেটার্নীর ব্যবস্থা। হরেন মাস্টার নির্বাক। কেবল প্রতিবাদ করেছিল শেফালী। ও বলল,

- আমি হাসপাতালে যাব না; ছমিরণ দাইকে মাছ কাটা বটি দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলব আমি। খালা বলল,

- তোর ও পাপ তুই কতদিন বইবি?

- ও পাপ না-বিধাতার অমোঘ লিখন-আশীর্বাদ; না হলে ও বেশ্যার পেটে আসবে কেন? তীক্ষ্ণ গলায় উত্তর করে শেফালী।

তারপর অনেক কথা জল্পনা-কল্পনা শেষ করে শেফালী একদিন সাধ খেল পাড়ার এক বেশ্যার ঘরে। অবশ্য এর ব্যবস্থা হরেন মাস্টারই করেছিল। সাধ খেতে বসে মাস্টার যখন শেফালীকে একটা নতুন কাপড় দিয়ে আশীর্বাদ করতে গেল, শেফালী তখন বলল,

- আশীর্বাদ কর মাস্টার, আমার যেন জুঁই ফুলের মত সাদা ধবধবে একটা মেয়ে হয়।

শুনেই সবাই দাঁতে জিব কেটেছিল। একে পাপ তারপর আবার মেয়ে -এ তুই কি বলছিস শেফালী? রেবতির প্রশ্নে ফুঁসে উঠেছে শেফালী,

- এ পাপ না; মুখ সামলে কথা বলবি তোরা।

শেফালীর রুদ্র মুর্তির সামনে রেবতি যেন চুপসে গিয়েছিল সে সময়।

তারপর সামনের বর্ষার শুরুতে এক রাতে যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠল শেফালী। দিশে না পেয়ে খালা দৌড়ে গিয়ে মাস্টারকেই ডাকতে লাগল,

- মাস্টার, ও মাস্টার একবার এদিকে এস দিকিনি, শেফালীর যে ব্যথ্যা উঠেছে ...

শুনেই লাফ দিয়ে মাস্টার। তারপর পড়িমরি করে ছুটে আসে শেফালীর ঘরের দিকে। ছমিরণ দাইকেও ডাকা হলো। একজন একজন করে অন্যরাও এসে হাজির হল শেফালী ঘরের। শেষ রাতের দিকে যমে মানুষে টানাটানি শেষে শেফালী শান্ত হলো। মুহূর্তে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল মৌরি পাড়ার বেশ্যা পাড়ার কোনে কোনে। হঠাৎ একটা মহা খুশির

রোল পড়ে গেল সবার মাঝে। একটি মেয়ে শিশুকে সাহসের সাথে জন্ম দেওয়ার আনন্দে আজ সকলেই আনন্দিত। শেফালীর যে চরম শত্রু ছিল সে ছুটে এসে সদ্যজাতকে কোলে নিয়ে আনন্দে চিৎকার করতে লাগল,

- ওরে দেখে যা আমাদের কি টুকটুকে একটা মেয়ে হয়েছে; ও মাস্টার একটা নাম রাখ দিকিনি আমাদের মেয়ের।

ঘরের সামনের এক কোনায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ সবকিছু দেখছিল মাস্টার। রেবতির কথায় চেতন ফিরে পেল হরেন মাস্টার। মিন মিন করে জিজ্ঞেস করল,

- শেফালী কেমন আছে? ভাল তো?

ছমিরণ ধাই জবাব দেয়,

- চিন্তা করো না মাস্টার, ও মাগী ভালই আছে।

- ফুলের মত মেয়ের নাম তাহলে ফুলকুমারী থাক; ছোট করলে দাঁড়ায় ফুলি। সেদিন থেকে ফুলি সবার মেয়ে হয়ে গেল। পিতৃপরিচয়হীন বেশ্যার মেয়ে ফুলি আর পাঁচটা মেয়ের মত সকলের মেয়ে হয়ে বাড়তে লাগল মৌরি পাড়ের বেশ্যা পাড়ায়।

গোল বাধল ফুলির বয়স যখন আট মাস। তখন ফুলি হাসতে শিখেছে; অল্প অল্প হামাও দেয়। আর দিনের বেশি সময় হরেন মাস্টারের কাঁধে কাঁধে থাকে তখন। একদিন সকালে সামান্য কারণে যথারীতি বেধে যায় তুমুল ঝগড়া। ঝগড়ার এক ফাঁকে খালা বলেই দেয়,

- তোর দেমাগ আমি শেষ করে দেব। তুই কার পাপ জন্ম দিয়েছিস আমি জানিনা ভেবেছিস, কচি খুকি পেয়েছিস; ছি! ওরকম মানুষটার সাথে শুতে তোর লজ্জাও করল না; তোর কি নরকেরও ভয় নেই লো মাগী?

শেফালী চিৎকারা করে কিছু বলতে গিয়েও যেন বলতে পারল না শেষ পর্যন্ত। তারপরও খালা চালিয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ তারপর আস্তে ধীরে সেদিনকার মত সব শান্ত হয়ে আসে। সূর্য ডুবল আবার মৌরি পাড়ের বেশ্যা পাড়া জীবন ফিরে পায়। গন্ধ তেলে চুল ভিজিয়ে বেশ্যাগুলো খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। লঘু তামাশায় হাসির বন্যা বয়। কেউ কেউ সস্তা গানও গায়। শুধু শেফালীর ঘরে লণ্ঠন জ্বলে না; শেফালী আজ চুল বাঁধেনি। শুধু বিকেল বেলা হরেন মাস্টারের কোলে ফুলিকে দিয়ে সে চলে আসে। আর কোন হদিস মেলেনি এ পর্যন্ত। যখন শেফালীর হদিস মিলল তখন, তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। বিষক্রিয়ায় তার মুখ কালচে হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোনে জমে থাকা ফেনা শুকিয়ে

গেছে। কোথা থেকে যে শেফালী বিষ জোগাড় করল তা আজো রহস্য। শেফালীর মৃত্যু সমস্ত পাড়াকে স্তব্ধ করে দেয়। শেফালীর এই মৃত্যু সংবাদের বিষে পাড়াটা যেন নীল হয়ে পড়ে। পাগলের মত কাঁদতে লাগল ববিতা, আরতি, পূর্ণিমা, শাবানারা। এমনকি পাষাণ হৃদয় খালাও শেফালীর লাশের পরে আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদেছে দীর্ঘক্ষণ। শুধু নির্বাক ছিল হরেন মাস্টার। শুধু শেফালীর মাথার কাছে বসে এলোমেলো চুলগুলো মুখের উপর থেকে একটি একটি করে সরিয়ে দিচ্ছিল ও। আর বিড় বিড় করে বলছিল,

- এ কি করলি গো তুই' নিজে পালিয়ে গেলি অভিমানী'।

এক পর্যায়ে ছমিরণ ধাই বলে ওঠে,

- উঠ মাস্টার, এখন অনেক কাজ!

এখন যে অনেক কাজ তা মাস্টারের অজানা নয়। বেশ্যা পাড়ায় কোন অপঘাত মৃত্যুতে পুলিশী ঝামেলা নেই। সমাজপতিরনা এদেরকে পতিতা করেছে। এখানে কেই মরলে শ্মশানে তাদের যাওয়ার অধিকার নেই আবার কবরস্থানেও তাদের জায়গা হয় না। কারণ এদের জাতের ঠিক নেই। অবশ্য এসব নিয়ম এ পাঁচ গ্রামের সমাজপতিদের তৈরী করা। কিন্তু তারা গোপনে এখানে আসেন। নানা ছুতোতে তারা ওদের ঘরে ঢোকে। বেশ্যাগুলোর শরীর হাতরায়। কখনো কখনো এদের শরীরের মধ্যে ডুব দিয়ে আকণ্ঠ পান করে নর্দমার নোংরা সুস্বাদু সুধা। কিন্তু এসব ঘরে অন্ধকারে। দিনের আলোতে এদের সাথে কথা বললে সমাজপতিদের মান যায়। তাই এরা মরলে লাশের স্থান হয় মৌরির বুকে। যথাসম্ভব রীতিনীতি মেনে লাশের বুকে একটা ভারি কিছু বেঁধে হরেন মাস্টার

কাঁধে নিয়ে মৌরির দিকে এগুতে থাকে; পিছনে শোকস্তব্ধ একদল নামহীন জাতহীন, গোত্রহীন বেশ্যা আর ফুলকুমারী। মৌরির পাড়ে দাঁড়িয়ে ওরা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন, ওদের বেশ্যা বানিয়েছেন। তারপর ওরা মৌরি নদীকে ওদের ভক্তি নিবেদন করে, যে নদী এই বেশ্যা পাড়ার জীবন প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখে তারপরও শেফালীকে শুইয়ে দেওয়া হয় মৌরির জলে। মুহূর্তে শেফালী তলিয়ে যেতে থাকে। পা হাত বুক মাথা এক সময় চুলও। এক অন্ধকার জীবনে তলিয়ে যাওয়া শেফালী আর এক অন্ধকারে হারিয়ে যায় মুহূর্তেই। এক এক করে সবাই ফিরে আসে নিজেদের কুঁড়েতে। শুধু হরেন মাস্টার মৌরির পাড়ে বসে থাকে ফুলিকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্বাক।

এসব পুরনো কথা। সবাই ভুলেছে। বেশ্যাদের এত অনুভূতিপ্রবণ হলে চলেনা।

কিন্তু ফুলি বড় হয়েছে এখন। ফুলির সাথে যারা কলা পাউরুটির লোভে হরেন মাস্টারের ঘরে যায় তারা এখনো পর্যন্ত শুধু যায়-ই। ফুলিই ব্যতিক্রম। এখন ফুলি বেশ ক'টি ইংরেজী ছড়া পড়তে পারে; ছোট ছোট হিসেব কষতে পারে। চিঠি লিখতে ও পড়তে শিখেছে সে ইতিমধ্যে। এমনকি ওর খালা/মাসীদের যৌন রোগের ঔষধের খোসাগুলো পড়ে দেয় মাঝে মধ্যে। ফুলি পাড়ার আশা-আকাঙ্খার সলতে। আজ হরেন মাস্টার সবাইকে তার ঘরে ডেকেছেন। সকলেই হাজির হয়েছে এই পড়ন্ত বেলায়। তবে কিছু নতুন মেয়ে আসেনি এখনো। পাড়ায় কিছু নতুন মেয়েও এসেছে এখন; তাদের কাছে হরেন মাস্টার বুড়ো বৈ আর কিছুই নয়। তবুও অনেকেই তাকে মানতে বাধ্য হয়। খানিক পর হরেন মাস্টার ফুলিকে কাঁধে নিয়ে সবার সামনে এসে দাঁড়ায়। অবিকল আগের মত ফুলি মাস্টারের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। অনেকেই সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে আর চোখ ভিজেক উঠল নিজেদের অজান্তে। এর মাঝে হরেন মাস্টার বলে উঠল,

- তোমরা সবাই আসাতে আমি খুশি; আজ একটা বিশেষ কারণে তোমাদেরকে এখানে ডেকেছি;

ছমিরণ ধাই এখন কানে শোনে না ভাল। সেও একটু এগিয়ে আসে। মাস্টার বলে চলে,

- ফুলি আজ পড়তে লিখতে শিখেছে; ও তোমাদের সন্তান; তোমরা সবাই ওর মা।

'মা' কথাটা শুনেই পুর্ণিমা, শাবানা আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নেয়। মাস্টার বলে,

- আগামী কাল ফুলিকে উজ্জ্বলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে যাব। সবই মুখ চাওয়া-চায়ি করে। এ পাড়ার কেউ স্কুলে ভর্তি হওয়া, এমনকি পড়া লেখা করার কথা কল্পনা করাও গতকাল পর্যন্ত পাপ ছিল। আজ এই আনন্দ সংবাদে মৌরি পাড়ের বেশ্যারা হু হু করে কেঁদে ওঠে। আনন্দে বিস্ময়ে। হরেন মাস্টার বলে,

- তোমরা সকলেই ফুলির মা, ফুলি তোমাদের সন্তান; পরীক্ষায় পাশ করলেই সে স্কুলে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তোমরা সকলেই তোমাদের সন্তানের জন্য প্রার্থনা কর; কথা শেষ করে হরেন মাস্টার ফুলিকে নামিয়ে চোখের জল আড়াল করতে দ্রুত ঘরে চলে যায়। রেবতি দৌড়ে এসে ফুলিকে কোলে নিয়ে কাঁদতে থাকে। কাঁদছে সবাই, আবার হাঁসছেও সবাই। কান্না-হাসির দোলায় দুলছে মৌরি পাড়ের বেশাপাড়া। এর মধ্যে সুর্য পশ্চিমে ডুব দেয়।

পরদিন বেশ্যা পাড়ায় সকালটা হল একটু অন্য রকমের । সকলেই মৌরির জলে স্নান সেরে নিজেকে পবিত্র করেছে। সারিবদ্ধ ভাবে জড় হয়ে মৌরির পাড়ে প্রতিক্ষা করছে

তারা কখন হরেন মাস্টার ফুলিকে নিয়ে নৌকায় উঠবে। বলতে বলতে মাষ্টার আর ফুলিকে আসতে দেখা যায়। আজ ফুলি হেঁটে আসছে; ফুলির পিছনে ওর এ পাড়ার বন্ধুরা; খালি গায়ে; খালি পায়ে। হরেন মাস্টার নৌকায় পা দেওয়ার আগে বলল,

- তোমরা ফুলিকে আদর করে দাও; ও যেন পরীক্ষায় ভাল করে।

রেবতি, পূর্ণিমা, শাবানা সকলেই ফুলির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, আঁচলে চোখ মুছল। ম্যাস্টার বলল,

- মাঝি নৌকা ছাড়, বেলা বাড়ছে।

মাঝি নৌকার দাড়ি তুলে নেয়। মৌরির ঢেউ কেটে নৌকা এগিয়ে চলে উজ্বলপুরের দিকে। এ পাড়ের বেশ্যাগুলো মানুষ সেজে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের পিতৃপরিচয়হীন এক দঙ্গল কঙ্কালসার ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নৌকার উপর দাঁড়িয়ে ওদের আশা-আকাঙ্খার সলতে ফুলি, ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে। সকালের আলো এসে পড়েছে মাস্টার আর ফুলির মুখে। সেই চকচকে আলোয় ফুলির মুক্তা দানার মত মুখটা অবিকল ওপারের ভদ্র মানুষের বাচ্চার মত দেখাচ্ছে।

প্রত্যাখান

– যুদ্ধ হোসেন।

– কি? যুদ্ধ হোসেন? কোন মানুষের নাম এমন হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। বলেই আরাফাত চৌধুরী বিরক্ত মুখে তার টেবিলে রাখা যুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজে চোখ বুলাতে লাগলেন। বেল টিপলেন বিরক্ত মুখে। তার পিয়ন কে, দশ মিনিট পর কফি দিতে বললেন এবং পুনরায় কাগজ পত্র গুলো সযত্নে দেখতে লাগলেন।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে অখন্ড নীরতা। শুধু এসি'র একটা ঝির ঝির শব্দ আছে বলে মনে হয়। যুদ্ধ নিজেও বেশ বিরক্ত। সারা রাত ট্রেন জার্নি করে ঢাকায় পৌঁছেছে আজ ভোরে। কোচে আসলে ভাল হত কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। তারপর খালার বাসা; মীরপুর, কাজীপাড়া। কমলাপুর ষ্টেশন থেকে মীরপুর। যুদ্ধ হোসেন যখন তার ছোট খালার বাসায় পৌঁছাল তখন ঢাকাতে ভোর আর সকালের মাঝামাঝি। ঘুমন্ত ঢাকা আস্তে ধীরে তার চোখ খুলছে। তার শরীরে তখনো রাতের ক্লান্তি আর ঘুমের আলস্য লেগে আছে। এই সাত সকালে ঢাকা শহরের কেউই কোন উটকো মেহমান পছন্দ করে না– করার কথাও না। যদিও যুদ্ধের মা গত পরশু মোবাইল ফোনে তার খালা কে বলেছিল, "আগামী ২৫ তারিখ যুদ্ধ তোদের ওখানে যাবে; একটা লিখিত পরীক্ষা দিয়েছিল–– তারই ভাইবা পড়েছে এই দিন।" শেলি খালা কোন উৎসাহ দেখান নি। উত্তরে বলেছিল, "আবার ভাইবা! কটা হল? এখন লোক না থাকলে চাকরী হয় না; যদিও ওর রেজাল্ট ভাল, তারপরও বলি আপা, ওকে একটু স্মার্ট করে, তোমার জামাই -এর ফার্মে লাগিয়ে দাও; আমাদেরও একটা বিশ্বাসী লোক লাগে"।

ঢাকাতে আসা বা না আসার ব্যাপারে পরিস্কার কোন ইঙ্গিত ছিল না শেলি খালার কথায়। যুদ্ধকে আসতেই হয়েছে শেষমেষ। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই মানিয়ে নিতে হয়। সেও নিয়েছে। এসব মানিয়ে নেওয়ার পরও শেলি খালার বাসার কলিং বেল টিপতে ইচ্ছা হচ্ছিল না যুদ্ধের। এক সময় এ ক্ষেত্রেও মানিয়ে নিতে হয় তাকে। ঘুমন্ত চোখে বুয়া এসে গেটের তালা খুলে দিয়ে বলে,

– আফার উঠতে দেরি হইব; আফনে অহন রেস লন; সকাল হইলে নাস্তা দিমু....

সুন্দর সাজানো গোছানো গেস্ট রুমের তৈরি বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয় যুদ্ধ। গাড়ির দুলোনি এখনো শরীরের সাথে লেপ্টে আছে। ভিতরে ভিতরে দুলছেও সে কিছুটা। সাথে সাথে দুলছে তার সমস্ত ভাবনার জগৎ। খুবই পরিপাটি করে সাজান গেস্ট রুম। একদিকে স্তরে স্তরে সাজান দামি দামি বই। মরিস বুখাইল, অরুন্ধুতি রায়, শামসুর রাহমানের কবিতা সমগ্র, বুখারী শরীফ, গীতাঞ্জলি, শেক্সপিয়ার ড্রামাস, হুমায়ুন আহমেদ। দেওয়ালে দামি পেন্টিং, শো-পিচ, ঘড়ি প্রভৃতি। দেওয়ালের অন্যদিকে ঝকঝকে কার্বাডে ফারাসি কাঁচের গেলাস আর পেট মোটা বোতলে হালকা সোনালী রংয়ের তরল। যুদ্ধের সমস্ত ভাবনা গুলো তালগোল পাকিয়ে ঘরের মসৃন দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত হয়। এই আভিজাত্যের সংঘাত যুদ্ধকে এক ভীষণ দো'টানায় ফেলে দেয়। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে সে কিছু না দেখার দৃষ্টি দিয়ে, সবকিছু দেখতে থাকে। ক্লান্তি ধকল আর মানসিক উত্তেজনার কারণে যুদ্ধের ঘুম হল না। অতঃপর গোসল সেরে জামা জুতো টাই বেঁধে তথাকথিত ভদ্রলোক সেজে সে রওনা হয় ধানমন্ডির উদ্দেশ্যে।

আরাফাত চৌধুরী কাগজ থেকে চোখ না তুলেই সদ্য আসা কফির মগে ছোট্ট চুমুক দিলেন; তারপর তৃপ্তির সাথে মুখ তুলে যুদ্ধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আব্বার নাম কি?"

যুদ্ধ বুঝতে পারে, এগুলো কথার কথা, নিয়মের নিয়ম। কারণ, চৌধুরী সাহেবের সামনে তার নাম ঠিকানা সহ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য পড়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি তা দেখে নিতে পারেন। তবে, সাধারণত এম.ডি সাহেবেরা এমনটি করেন না। এসব অভিজ্ঞতা যুদ্ধের ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন চাকরীর ইন্টারভিউ ফেস করতে করতে সে দিব্বি বলে দিতে পারে, কোন ভাইবা-য় তার চাকরী হবে না; কোন চাকরীতে লোক ঠিক করা আছে প্রভৃতি। যেমন এই মুহুর্তে তার মনে হচ্ছে, এই ভাইবাটাও ভেস্তে যেতে বসেছে। এই কথা মনে হতেই, ক্লান্তি এসে ভীড় করে যুদ্ধের মনে; রাত জাগা ক্লান্তি। টাই-টা ফাঁসের মত চেপে বসছে গলায় ক্রমেই। আসলে, নিজের জন্য তার খুব বেশী চিন্তা নেই। চিন্তা তার মা আর ছোট, পরিবারটির জন্য। এই তো কিছুদিন আগে মা অনেক পরিশ্রম করে এলাকার এম.পি সাহেবের কাছ থেকে তার স্বামীর যুদ্ধে অংশগ্রহণের দালিলিক প্রমাণ পত্রটি আনতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এর জন্য তাকে তার সামান্য সঞ্চয়ের হাত দিতে হয়েছে। পুড়াতেও হয়েছে অনেক কাঠ-খড়; ধন্না দিতে হয়েছে দিনের পর দিন। সার্টিফিকেটটা হস্তান্তরের সময় নিজেকে "বীর" মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবী করা এম.পি

সাহেব ছিলেন খুবই আন্তরিক। তিনি বলেন,

– আপা, আমার ইচ্ছা ছিল একটা জাঁকজমক অনুষ্ঠান করে, এই মহান মূল্যবান সনদটি আপনার হাতে তুলে দেব; কিন্তু দেশের পরিস্থিতি ভাল না .... বলেই তিনি টেলিফোনে সদর থানার কোন দারোগা কে ধমকাতে লাগলেন,

... দু'লক্ষের বেশী ভোট পেয়েছি আমি; আমি পার্লামেন্টে আইন পাশ করি; আর সে আমি তোমার মত "দু'ফুলের পুলিশের কাছে আইন শিখব! আরে আমি যা বলি সেটায় আইন ... ... যুদ্ধের মা আর সেখানে দাঁড়ায়নি। তারপর নানা দরখাস্তের সাথে এই মূল্যবান সনদের ফটোকপি যুদ্ধ কে জুড়ে দিতে হয়েছে বার বার। যতবার বাজারে এই অমূল্য সনদের ফটোকপি করাতে গিয়েছে সে, ততবারই তাকে শুনতে হয়েছে, "এখন কি করছ?" "কিছু হল?" "উপর তলায় কেউ কি নেই তোমায়?" "এবার হয়ে যাবে ইত্যাদি। ভাল রেজাল্টের পাশাপাশি সে আরও মুখস্ত করেছে প্রশ্ন ব্যাংক, ওরাকল, কারেন্ট ওয়াল্ড, আরো কত কি; তারপরও কেউ কথা রাখেনি ... আজ উনিশতম ভাইবা ফেস করছে সে। যথাসম্ভব সংযত ভদ্র ভাবে উত্তর করে,

– শহীদ ওয়াকিল হোসেন।

– এই 'শহীদ' শব্দটি কি তোমাদের বংশীয় কোন টাইটেল?

– জ্বী না; আমার বাবা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হন।

– আর তুমিও সেই সুযোগে বিভিন্ন পরীক্ষায় এই শব্দটি বাবার নামের পূর্বে জুড়ে দিয়ে সকলের করুনা ভিক্ষায় ব্রতী হয়েছ; তোমার জন্ম তারিখ?

এই কথার পর যুদ্ধের আর কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তার শুধু মুখ নয় হৃদয় মন সব তেঁত হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে মুখ খুললেই বমি হয়ে যাবে। কিন্তু তার একটা চাকরীর খুব দরকার। শিকেই রাখা শূন্য হাড়ির মত তাদের ছোট্ট পরিবার টি যুদ্ধের কল্পনায় চকিতে ভেসে ওঠে। মায়ের চোখের নিচে ঘন নিবীড় কালি জমতে শুরু করেছে– যুদ্ধের একটা চাকরীর বড় প্রয়োজন! যুদ্ধ উত্তর করে,

– ১৯৭১ সাল ২৬ আগস্ট।

আরাফাত চৌধুরী তৃপ্তির সাথে কফির কাপ নামিয়ে আবার বেল টিপলেন। ম্যাচের জন্য। ধীরে সুস্থে পাইপে আগুন জালিয়ে আধপোড়া কাঠিটি দামি অ্যাশট্রের মধ্যে গুজে, একবুক নীলচে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন সারা ঘরে। ধোঁয়ার গন্ধটা সিগারেটের মত কটু নয় মোটেও। কোমল একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ঘরে। আরাফাত চৌধুরী জিজ্ঞাসা

করলেন,

– ধোঁয়াতে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? অব কোর্স আই এ্যাম সাপোজ টু বেগ মাই এ্যাপোলজি। এই নেশাটা ছাড়তে পারছিনা কিছুতেই; নেশা করা উচিত নয়; ধর্মেও 'নেশা' কে ঘৃণা করতে আদেশ দিয়েছে।

যুদ্ধ সবিনয়ে সামান্য উত্তর করে,

– না।

চৌধুরী সাহেব তার বর্ষীয়ান অথচ চকচকে চাহুনির চেহারাটা আরামদায়ক রিভলভিং চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

– আবেগ, এই বস্তা পচা আবেগের চর্চা করেই এই জাতিটা পড়ে থাকল অন্ধকারে দীর্ঘ সময় ধরে। আরে আবেগ ছাড়া মানুষ হয় না ঠিকই– বস্তুত হওয়াও উচিৎ নয়; তাই বলে এতটা আবেগী হতে হবে! ..... এ অবস্থায় যুদ্ধের শুনে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সে পাথরের মূর্তির মত বসে সবকিছু শুনতে থাকে, আর প্রাণ পনে বুঝতে চেষ্টা করে লোকটাকে। যুদ্ধ ভাবতে থাকে, এখন কি প্রশ্ন আসতে পারে?

চৌধুরী আবার বলেন উঠলেন,

– এই ধর, একটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে, আর প্রতিবেশী কোন একটি দেশের অতি আগ্রহে এই ভূখন্ডে '৭১ সালে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীতে, যাকে তোমরা, মানে আমরা, নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে তৃপ্তি পাই। ইতিহাস রচনা করি। মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, ইতিহাসে আবেগের কোন স্থান নেই। ভদ্রলোক একটু থামলেন। তারপর আবার বলেন,

– সেই অস্থির সময়ে তোমার জন্ম। আমি ধরেই নিচ্ছি যে, সে সময়ের প্রভাবে তোমার নামটা এমন উদ্ভট, শ্রুতিকটু। আচ্ছা মনে কর, এই ঢাকা শহরে যদি একটা প্রলঙ্গকরী ভূমিকম্প হয়, আর সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মধ্যে যদি কোন শিশু জন্ম নেন, তবে সেই শিশুর নাম কি "ভূমিকম্প" হবে? টেল মি? আনসার মি প্লিজ ... ...

এবার যুদ্ধ একটু নড়ে চড়ে বসল। প্রথম বারের মত সে তার কৌতুহলী .... দৃষ্টি দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে শুরু করে। এই জুন-জুলাই এর চোখ ঝলঝানো দুপুরেও এই ঘরে আলো আঁধারের খেলা; বিশাল শো কেসে ঠাসা দামি দামি বই। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, কবিতা, দর্শন প্রভৃতি। শো কেসের উপর বাঁধায় করা সমাবর্তনের ছবি: তার পাশে কোন আরবীয় আমীরের সাথে করমর্দনরত হাস্যজ্জ্বল ছবি। দেওয়ালের একপাশে

প্রাচীন আরবের বিশাল ম্যাপ। অন্য দিকে একটি উঠের দৌড়ের ছবি। এতই জীবন্ত যে, বেশীক্ষন তাকানো যায় না ছবিটার দিকে। আর আছে অর্ধনগ্ন নারীর অসাধারণ এক পেন্টিং। নারীটি পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার জলে খেলছে। অপূর্ব দামি কার্পেটে বিশাল ঘরটি মোড়ানো। পাশে রকিং চেয়ারে "আমি জিন্না বলছি" বইয়ের ইংরেজি ভার্সন আদ খোলা পড়ে আছে। ঘরময় ছড়িয়ে থাকা এই বিত্ত বৈভব আর প্রাচুর্য্যের মাঝে যুদ্ধ হঠাৎ করেই যেন উদাস হয়ে যায়। লাটাই থেকে ছুটে যাওয়া ঘুড়ির মত সে এলো মেলো উড়তে থাকে– উড়তে থাকে। পরক্ষণে সে কোন অচেনা দিঘিতে তেলাপিয়া মাছ ধরতে ডুব দেয়। লম্বা ডুব! গহীন জলে ডুব দেয় যুদ্ধ। তার কানে গহীন জলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই; সে তলিয়ে যেতে থাকে, তলিয়ে যেতে থাকে .... শরীরের ওজন হারিয়ে যায় তার; নিজের শরীরটা কে মনে হয় অন্যের। এবার আরাফাত চৌধুরী সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন, "না না, আমিও একজন বাংলাদেশি। আমিও আমার দেশের জলবায়ু, মাটি, নদী ফসলের মাঠ, আমাদের কৃষ্টি নিয়ে গর্ব করি। এদেশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আমি ভীষন গর্বিত''।

ভদ্রলোক সামন্য থামলেন, তারপর আবার বললেন,

– তোমার মত আমারো রেজাল্ট ভাল। আমি দেশে বিদেশে লেখা পড়া করেছি। এখন মধ্যপ্রাচ্যের একটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়াই। কিন্তু এক সময় এই মাটিতেই আমাকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুড়তে হয়েছে। যখন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সময় তখন এদেশে বসবাসরত ভিন দেশের পোষা কিছু বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে প্রত্যাখান করেছে আমার অতীত কে কেন্দ্র করে।''

যুদ্ধ আবার বর্তমানে ফিরে আসে। এবার তার মনে হচ্ছে এসব বৃথা চেষ্টা করা ছাড়তে হবে। এবার বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে প্রাইভেট পড়াবে সে। খুব মন দিয়ে। আর চকরির জন্য দরখাস্ত করাও আজ থেকে বন্ধ। ভদ্র লোক সামান্য সামনে ঝুঁকে আবার বলল,

– গেরিলা যুদ্ধে একটি দেশ স্বাধীন হয় না – যদি হতো, তাহলে চীন আজো মহাচীন হয়ে থাকত না। কোন দেশ কাউকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিতে পারে না। পবিত্র বদরের যুদ্ধে বিশাল কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র ক'জন মুসলমান জিতেছিল–

কিন্তু তাদের পক্ষে স্বয়ং রব্বুল আল আমিন ছিলেন। গ্রীক মিথলজিতে দেবতারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মহান আল্লাহ পাকের রহমত ছিল অসীম। কিন্তু আজ আমরা শুকরানা আদায় না করে, কিছু মানুষকে মহান করার চেষ্টায়

মত্ত–– অল বোগাস এ্যকচুলি।

এবার লড়াই সংগ্রামের কথা উঠতেই যুদ্ধও ভেসে যায় স্মৃতির ভেলায়। গেরিলা যুদ্ধের কথা উঠতেই বাবার কথা মনে পড়ে। কুষ্টিয়ার যুদ্ধ, দীনদত্ত ব্রীজ উড়ানোর যুদ্ধ, মিরপুরের রেল স্টেশনের লড়াইয়ে তার বাবা সক্রিয় ছিল। মারাও যায় একদিন হঠাৎ। মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস বাবা-র রক্তমাখা জামা মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল,

– "ভাবী, আমার দোস্ত শহীদ হয়েছে। আমরা একসাথেই ছিলাম। সে ছিল অসীম সাহসী আর ভাগ্যবান। হঠাৎ করেই দোস্ত আমার, আমাদের চেয়ে অনেক অনেক মহান হয়ে গেল"...... যুদ্ধের মা, তার স্বামী'র রক্তমাখা জামাটা তার পেটে চেপে ধরে ছিল। যুদ্ধ তখন পেটে। যুদ্ধ মাতৃজঠরে থেকেই তার বাবার জামার ওম পেয়েছিল; বাবার গায়ের ঘামের গন্ধ নিয়ে ছিল। তার জন্মের পর তার মা-ই তার নাম করণ করেছিল 'যুদ্ধ'। – এসবই সে তার মার মুখ থেকে শুনেছে, অনেক বার।

এই ভদ্রলোকের কথা গুলো যুদ্ধের মোটেও ভাল লাগছে না। আবার সব কথা সে হওয়ায় উড়িয়ে দিতেও পারছে না। তার হয়তো কিছু বলা উচিৎ। দীর্ঘক্ষন সে কোন কথা বলছে না–– এটাও একধরনের অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ ভাবে।

কিন্তু কথাটা কিভাবে বলবে সে। ঝাঁঝের সাথে না ভদ্রচিত ভাবে– সেটা ভাবতে থাকে যুদ্ধ। তার মাঝেই চৌধুরী সাহেব বলে উঠেন,

– আমাদের জাতীয় কবি নজরুল যার জন্ম অন্য দেশে। তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কত গুলো শিক্ষিত সুবিধাবাদীদের পরামর্শে। অথচ, কবি জসিম উদ্দিনের– তিনি বাংলাদেশের কবি। কবি ফররুখ আহমেদ, যিনি সাহিত্যে এনেছেন ইসলামিক দর্শন। আরে যে দেশে ৮০% উপর মুসলমান সেদেশে তো ফররুক-ই হবে জাতীয় কবি। তা না হয়ে জাতীয় কবি করা হয়েছে এমন একজন কে যার কাব্যে আছে কাফের জাহেলদের তৈরি মতবাদ, সাম্যবাদ। নাস্তিক্যবাদের সুড়সুড়ি আর আছে হিন্দুদের শ্যামা সংগীত।

এবার যুদ্ধের ভিতর থেকে কে যেন ভিষন প্রতিবাদী হয়ে উঠে; বলে উঠে,

– ভৌগলিক সীমানা অথবা কারো জন্মস্থান– এগুলো কারো কাব্য প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুব কি গুরুত্ব বহন করে?

– না মোটেও না। দ্যাখ, রবীন্দ্রনাথের জাপান দেশটি ছিল খুব পছন্দের। সেখানকার মানুষ ও রবীন্দ্রনাথ বলতে পাগল প্রায়; অথচ তাদের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন কোন এক জাপানীজ। অথচ...

যুদ্ধের সহ্যের বাঁধ প্রায় ভেঙ্গে যায়। আর এক মূহুর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না তার। "বেশ কিছু টাকার অপচয় হল"– মনে মনে বলল সে। ঠিক এ মূহুর্তে কেউ একজন তার সামনে নামিয়ে রাখল আমের জুস, এক গ্লাস পানি আর এক মগ ধোঁয়া উড়া কফি। যুদ্ধের মনে হল তৃষ্ণায় বুকের ভিতরটা হাহাকার করছিল। অনেক আগেই পানি খাওয়া প্রয়োজন ছিল। গ্লাস গুলোর দিকে লোভাতুর দৃষ্টি ফেলতেই আরাফাত চৌধুরী বলে উঠলেন,

– নাও, আমের জুস। বিদেশী আম, পিওর! ওদের দেশের ইতিহাসে আমাদের মত আবেগ নেই; পাশাপাশি, ওদেশে আমে কেউ প্রিজারভেটিভ মেশায় না। খাও ভাল লাগবে।

বিনা বাক্যে পানীয় টুকু শেষ করে, কফি পান করতে করতে যুদ্ধ আবার সুতো কাটা ঘুড়ি হয়ে যায়। এর শেষ কোথায়? আবার সকাল হবে রাত পোয়ালেই। তাকেও ফিরে যেতে হবে সেই তেল চিটচিটে জীবনে যেখানে হতাশার সাথে দিবারাত্রি। যুদ্ধের চোখ চলে যায় উঠের ছবিটার দিকে। কি জীবন্ত ছবি। বেশীক্ষন তাকানো যায় না..... তার জীবনটা যেন আটকে আটকে গেছে উঠের পায়ে জকি হয়ে। শুধু তার কেন আটকে গেছে তার মত লাখো ছেলের জীবন। রেস চলছে ঢাকা সহ সারা দেশে। উটের দৌড়। এলাকার এম.পি তার নিজ এলাকায় আর এখানে চৌধুরী সাহেবের উটের চালক। উটগুলো দৌড়ুচ্ছে, আর ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করছে যুদ্ধের মত লাখো সম্ভাবনাময় জীবন। হঠাৎ যুদ্ধ উটের খুড়ের শব্দ শুনতে পায়; মনে হচ্ছে অসংখ্য উট এক সাথে দৌড়াচ্ছে, তাদের খুড়ের আঘাতে উড়ছে বালিঝড়; সে ঝড়ে পথ চিনতে পারছে না যুদ্ধ– দিক ভ্রান্ত হয়ে পড়ছে সে– কিন্তু এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা কেউ একজন ঠিক তখনই বলে ওঠে, "এখানে আর মূহুর্ত নয়..." কফির মগটা মানিয়ে সবিনয়ের যুদ্ধ বলে,

– স্যার, আমি আজ তাহলে উঠি; অনেক পথ যেতে হবে। এই প্রথম ভদ্রলোক হাসলেন। যুদ্ধের ধারণা ছিল ভদ্রলোক হাসতে জানে না। লোকটি হাসিটা বেশ সুন্দর। নাকি লোকটা সুন্দর বলে হাসিটা সুন্দর। ঠিক মেলাতে পারে না যুদ্ধ। আরাফাত চৌধুরী বলেন উঠেন,

– ইয়েস ইয়ং ম্যানে, মাইলস্ টু গো বিফোর ইয়্যু স্লিপ। তুমি তো বেশ অবাক নিঃশ্চয়, এ কেমন ভাইবা? যেখানে কোন প্রশ্ন নেই? তোমাকে আমার কোন প্রশ্ন করার নেই। গত

দেড় দু'মাস ধরে আমার মানে আমাদের লোকেরা তোমার উপর নজর রেখে আসছে। তোমার সব তথ্য আমার জানা। তোমার এই পদে চাকরী পাওয়ার জন্য দরখাস্ত পড়ে মোট তিন হাজার বত্রিশ টি। আমরা মোট দশ জনকে নিয়েছি। তার মধ্যে, সাত জন আমাদের লোক আর তিনজন তোমার মত বিদ্যান ও সৎ ছেলে। দ্যাট মিনস্ তুমি চাকুরীটা পেয়েছ।

এসব কি শুনছে যুদ্ধ! ঠিক শুনছে তো! এবার সত্যিই যুদ্ধে কেমন যেন ভয় ভয় লাগল। আবার মনে হচ্ছে, যা শুনছে যে, তা সব সত্যি তো! ভদ্র লোক আবার বলেন,

– তোমাকে আমরা শুরুতে দেব পঁয়ত্রিশ হাজার। সব মিলিয়ে পরে অংকটা বাড়বে। চাকরী ছয় মাস পুর্ণ হওয়ার পর পাকিস্তান সহ গালফ কান্ট্রিগুলো তে একটা দু মাসের টুর পাবে তোমরা। অব কোর্স, স্ব বেতনে–

গা মাথা টলছে যুদ্ধ। ভোরের সেই দুলুনিটা আবার অনুভব হচ্ছে, মুখের ভিতরটা তিতো তিতো মনে হচ্ছে আবার। হঠাৎ একটা বাড়তি 'ওম' অনুভব করে যুদ্ধ; সাথে তাজা রক্তের গন্ধ। খুব চেনা রক্তের গন্ধ; খুব পরিচিত....

ভদ্র লোক আবার বলেন,

– তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। যাওয়ার সময় আমার পি.এস এর টেবিল থেকে নিয়ে নিও; আগামী মাসের সাত তারিখের মধ্যে যে কোনদিন তোমার জয়েনিং। বাই দা ওয়ে, তার আগে তোমাকে আরও কিছু বাড়তি টাকা দেওয়া হবে, তোমার টি,এ আর পোষাকের খরচ। অফিস পোষাকের বিষয়টা বিশেষভাবে নজরে রাখে, মনে রাখবে। আমি এখন উঠব। আল্লা হাফেজ....।

যুদ্ধ যখন অফিসের বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সেই গুমোট গরম আর নেই। এর মাঝে কখন জানি বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। চারদিকে সতেজতার চিহ্ন আর বৃষ্টির গন্ধ। যুদ্ধের মনও বেশ সতেজ। চাকরীটা হয়েছে শেষ পর্যন্ত– এটা মনে হতেই ডান হাতে বুক পকেটে রাখা চকচকে সাদা খামটা, যার উপর আরবী আর ইংরেজী লেখা আছে 'তোমাকে সাথে পেয়ে আমরা গর্বিত, ছুঁয়ে দেখে সে। অফিস থেকে বাড়তি টাকাও দেবে যোগদানের সাথে সাথে। এসব ভাবতেই চৌধুরী সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা এসে যায় তার। কিন্তু আরাফাত সাহেবের বিশ্বাস, দর্শন এবং তার ও তাদের লড়াই। যুদ্ধ বুঝতে পারছে, চৌধুরী সাহেব একা নয়, তারা সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী। মূহুর্তে তার চোখে সামনে ভেসে উঠছে কুষ্টিয়ার যুদ্ধ; দীনদত্ত ব্রীজ উড়ানো যুদ্ধ; শতছিদ্র হওয়া বাবার রক্তাক্ত শার্ট!

আবার যুদ্ধ তার বুক পকেটে সযত্নে রাখা চকচকে খামটাকে আরো একবার স্পর্শ করে, যেখানে লেখা আছে, “তোমাকে পেয়ে আমরা গর্বিত।” যুদ্ধ বিড়বিড় করে বলে উঠে, “আমি কি তাহলে এখন থেকে ওদের দলে? যারা পদ্মা-মেঘনার বিস্তৃত পলিমাটির প্রান্তরে উটের দৌড় করাতে চাই!”

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে- অজানা কোন আশংকায়! মনে মনে যুদ্ধ দৃঢ় ও সংযত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মূহুর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠে, তাদের ছোট্ট সংসার, বিষন্ন মার মুখ যার, চোখের নিচে নিবিড় আঁধার জমছে দিনে দিনে। চকিতে যুদ্ধের সামনে ভেসে উঠে গত উনিশটি ভাইবার সাজান খেলা; বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচয় দানকারীদের ক্ষমতাশালীদের প্রত্যাখ্যান আর সস্তা করুনা! তার বাবার শহীদ হওয়ার সনদ সংগ্রহের জন্য তার মা-র প্রানান্ত চেষ্টা- আর অসহায় যুদ্ধের কিছু না করতে পারা......... এবার যুদ্ধের চোখে ভেসে উঠে আফতাব সাহেবের অফিস ঘরে টাঙ্গানো উটের দৌড়ের ছবি, মাস শেষের মাইনের অংক, চৌধুরী সাহেবের অকাঠ্য চাতুরীপূর্ণ যুক্তি, বিদেশ সফর আর এই বাংলাদেশ কে গ্রাস করার ওদের প্রস্তুতি–– যুদ্ধ আবার তাজা রক্তের গন্ধ পায় সাথে লোনা ঘাম। ছেঁড়া জামার ওম অনুভব করে সে আবার। যুদ্ধ প্রাণ পনে তার ঘূর্ণায়মান চিন্তার জগৎটাকে একটা স্থির জায়গায় দাড় করাতে চেষ্টা করে ....

যুদ্ধ, আবার তার চকচকে খাম- কে স্পর্শ করে। তারপর হঠাৎ সে মেঘ মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠে,

– না বাবা, যুদ্ধের কোন শেষ নেই; বেঁচে থাকায় যুদ্ধ ... .

আর তখনই পকেটে রাখা যুদ্ধের মোবাইল তীব্র স্বরে বেজে ওঠে, ক্ষিপ্র হাতে মোবাইল কানে নিয়ে আকুল কণ্ঠে যুদ্ধ বলে ওঠে,

– হ্যালো মা ... ...

ফিরে যাওয়ার গান

পাসপোর্টটা হাতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মোফাজ্জেল হোসেন মাষ্টার। নিজ এলাকায় সারা জীবন মাষ্টারী করেছেন তিনি। চারপাশে গিজগিজ করছে ছাত্র-ছাত্রী, তারপরও পাসপোর্টের দালাল শংকর বিশ্বাস -এর হাতে ছবি আর টাকা জমা দেওয়ার পর থেকে মোফাজ্জেল সাহেবের টেনশনের অন্ত ছিলনা। তারপরও তার ছাত্র শংকর বিশ্বাস বলল,

– টেনশন নিয়েন না স্যার, চেষ্টা করব। আসলে স্যার, সবাই পয়সা খায় রাক্ষসের মত। এ টু জেড; –এ দেশ কি চলে স্যার।

তবে মোফাজ্জেল মাষ্টার এসব আলোচনাকে পাত্তা দেননা। গুজব বলেই মনে করেন। তার মনে হয়, এই তো সেদিনকার কথা, লক্ষ লক্ষ মানুষ, হাজার হাজার প্রাণ, সম্ভ্রম সহায়-সম্বল উৎসর্গ করে দেশটার জন্ম হল। সেই সব বিভীষিকাময় দিনগুলো এখনো ভুলতে পারেনা মোফাজ্জেল –তবে, তিনি সে সব স্মৃতি ভুলতেও চাননি কোনদিন। বরং সে স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছেন এই দীর্ঘ সময়। আর তার জন্যই চলমান এসব আলোচনাকে জোর করে গুজব ভাবেন –আর এটা ভেবেই তৃপ্তি পান। কম্পিউটারে তৈরী চমৎকার ছোট বইটি পাঞ্জাবির বুক পকেটে রেখে হাত দিয়ে সে পাসপোর্টের অস্তিত্ব অনুভব করে, মোফাজ্জেল মাষ্টারের মনে হয়, নাহ, সব কিছু ঠিকই চলছে এখনো পর্যন্ত। শংকর বিশ্বাস এবার বলে ওঠে,

– স্যার, ডলার নেবেন না টাকা ?

– কোনটা নিলে ভাল হয় ?

– আসলে সবই জাল, কাউকে বিশ্বাস নেই; তবে আমাকে দায়িত্ব দিলে তার কোন মার নেই। স্যার, চা খাবেন ? র’ টি? সুগার ছাড়া ?

মোফাজ্জেল সাহেবের মনে পড়ে, এই ছেলেটা মোটেও গণিত বুঝত না। বিশেষ সুদকষা অংকগুলো। এখন বেশ ধনী লোক সে। দু’টো মোবাইল ফোনে অনবরত ফোন আসছে ; কথা বলছে -আর তার মধ্যে কনট্রাক্ট হচ্ছে। হঠাৎ মোফাজ্জেলের মনে হয়, ছেলেটা গণিতে কাঁচা হলেও জীবনের হিসেবটা কেমন সুদে আসলে বুঝে নিয়েছে। তার ভাল লাগে বিষয়টা দেখে। একটি নাতিদীর্ঘ শ্বাস নিজের মধ্যে চেপে সে বলে,

– বাবা তুমি যেটা ভাল বোঝ সেটাই করে দাও।

একজন চা দিয়ে গেল দু'কাপ। শংকর বলল,

– নেন স্যার, চা খান।

– কিন্তু, আমি তো চায়ের কথা বলিনি তোমাকে ...

– নো প্রবলেম স্যার। নেন। তবে ডলার নিলেও পারেন আবার হুন্ডি করলেও নো প্রবলেম।

মোফাজ্জেল মাষ্টার কিছুটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে এবার। তারপর মরিয়া হয়ে তারই এক সময়ের গণিত না পারা ছাত্রকে ভাল অথচ নিরাপদটা করার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানায়। শংকর বিশ্বাসও তার এই অনুরোধকে আদেশ হিসাবে মাথায় নিয়ে দ্রুত করে দেবে বলে মোফাজ্জেল মাষ্টারকে আশ্বাস দিয়ে গলাটা একটু খাদে নামিয়ে প্রশ্ন করে,

– সার, এ্যাদ্দিন বাদে ইন্ডিয়া যাচ্ছেন ক্যানে ?

প্রশ্নটা ছোট হলেও অনেক বড় উত্তর। এতদিন পর মোফাজ্জেল বি.এস.সি কেন কোলকাতা যাচ্ছেন? আসলে মোফাজ্জেল সাহেবের কোলকাতা যাওয়ার 'কারণ' বেশ জটিল। মোফাজ্জেল সাহেব ইন্ডিয়া মানে, পশ্চিমবঙ্গ গিয়েছিল সেই '৭১ এ। মুক্তিযুদ্ধের কালে শরনার্থী হিসেবে।

মোফাজ্জেল সাহেবের ওদেশে যাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়েছে সম্প্রতি ; তবে প্রস্তুতিটা চলছিল দীর্ঘ সময় ধরে। সেই ৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকের এক রাতে হঠাৎ আকাশ আলো হল তীব্র আলোর ঝলকানি, সাথে বাতাসে শীষ কাটার শব্দ। ঘুম লাগা চোখে আকাশটা দেখে তাদের মনে হচ্ছিল, কোন উৎসবে আতশবাজি পুড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এরই সাথেই হালদার পাড়া, ঘোষপাড়া থেকে ভেসে আসছিল প্রাণ হিম করা চিৎকার নিরীহ আকাশের গাল চাটছিল ঘর পোড়ানো লেলিহান শিখা। চারপাশটা কেমন আতংকগ্রস্থ হয়ে উঠেছিল মুহূর্তেই। মোফাজ্জেল মাষ্টার কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলাকার মসজিদ থেকে একদল মানুষ লাঠি, রামদা বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'নারায়েক তকবির' শ্লোগান দিয়ে যখন পাড়া প্রকম্পিত করল, তখনই মোফাজ্জেল মাষ্টার বুঝতে পারলেন, দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তান সৈন্যরা তাদের এলাকাতেও প্রবেশ করেছে। রাতের অন্ধকারে আর কোন দিনই তাকানো্র সুযোগ হয়নি তাদের। স্ত্রীর কোলে ছোট মেয়েটাকে আর একটা কাপড়ের পোটলা তুলে দিয়ে নিজের মাথায় পুরনো একটা লোহার বাক্স আর বড় ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রাজাকারদের প্রাণহিম করা চিৎকার, নারকীয় উল্লাস আলোকিত আকাশ, ঘর বাড়ী পোড়ার লকলকে

শিখা আর বাতাসে মৃত্যুর পদধ্বনিকে উপেক্ষা করে প্রাণ ভয়ে পালিয়েছিল মোফাজ্জেল মাষ্টার। সাত পুরুষের ভিটেমাটি, জমি জিরেত, এলাকার ব্যাংকে সামান্য কিছু টাকা, ঘরের আলমারিতে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, শরৎ, নজরুল এর পাশপাশি রাহেলে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সাজিয়ে রেখে, অজানার পথে অন্ধকারে এই পরিবারটি আরো অসংখ্য পরিবারের মত বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল সে রাতে। তারপর বর্ষার মাতন লাগা গাঙের জলে এক গুচ্ছ কচুরীপানার মত ভাসতে ভাসতে সকাল হয়ে যায়। ভোরের আলোয় রক্তাক্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এই দিশেহারা পরিবারটি নদীয়া জেলার বেতায় গ্রামের এক বাগদিপাড়ায় এসে পৌঁছায়। মোফাজ্জেল সাহেব বাক্যহীন। আতংকগ্রস্থ স্ত্রী, আফরোজার বুকে ক্ষুধায় তৃষ্ণা ক্লান্ত শিশুটি ঘুমিয়ে আছে দীর্ঘ সময়। বড় ছেলেটা সারাটা পথ দৌড়ে এসেছে। মাথার উপর গুড় গুড় শব্দে যখন শেল উড়েছে তখন ভয়ে আতংকে সে চিৎকার করে কেঁদেছে আর দৌড়েছে প্রাণপনে। ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তার কচি পায়ের পাতা। রাস্তায় কয়েকটি ক্ষত-বিক্ষত লাশ দেখে এখনো বমি করছে আফরোজা। বাগদিপাড়ার এক বাড়ীর পোয়াতী বউ মুখ বাড়িয়ে এই শরনার্থী পরিবারটিকে দ্যাখে। তারপর গভীর মমতায় বলে,

– তোমাগের ঘর বাড়ি কি পুড়ায়ে দেছে ?

ঢোক গিলে শুকনো গলাটাকে ভিজানোর চেষ্টা করে মোফাজ্জেল মাষ্টার; তারপর বলে,

– আমাদের বাড়িতে তখনো পর্যন্ত আগুন দেয়নি; পাশের পাড়ার একটি ঘরও নিস্তার পায়নি, এখন যে কি অবস্থা!

বাগদি বউটা আঁচলে চোখ মোছে। মোফাজ্জেল মাষ্টার বলেন,

– খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই জীবন বাঁচাতে জীবন নিয়ে ছুটছি, মা। জানি না কি হবে, কোথায় যাব? কিচুক্ষণ পর বাগদি বউটা বলে,

– আমরা খুব গরীব, ঘরে তেমুন কিছুই নাই। কটা শুকনা চিড়া আছে, আর আছে জল, খাইবেন?

জলের কথা শুনে, ছেলেটা তার শুকনো ঠোঁট আর আতংকগ্রস্থ চোখ তুলে বউটার দিকে তাকায়। বউটা দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে আবার বলে,

– বাবা আমরা ছোট জাত, গরীব মানুষ। আমাদের চিড়া খাইতে আপনের কুন অসুবিধা নাই তো? মোফাজ্জেল মাষ্টার বলে,

– মাগো, মহাপ্লাবনের সময় নূহু নবীর নৌকায় মানুষের পাশপাশি পশুও স্থান পেয়েছিল।

আজ আমাদের বড় বিপদ, মা এই মহা বিপদের সময়ে ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয়ই মূখ্য মা।

শুকনো চিড়ে আর জল অমৃত জ্ঞানে খেয়ে কিছুটা তৃপ্তি বোধ করে উদ্বাস্তু পরিবারটি। তারপর সামনে এগুনোর জন্য হাজার মানুষের মিছিলে পা বাড়ায় মোফাজ্জেল মাষ্টারের পরিবার। যাওয়ার সময় বাগদি বাড়ির পোয়াতী বউটি বলে,

– বাবা, আপনার ছেলে বাড়িতে নেই আজ তিনদিন; মাছ ধরতে গেছে। আপনি বাবার মত, আশীর্বাদ কইরেন আমার বড় ভয় লাগে- সময়টাতো ভালনা ...

চোখে পানি এসে যায় মোফাজ্জেলের। বউটার মাথায় হাত রেখে বলে,

– মা রে, তোমার কোন ভয় নাই। আল্লাহ তোমায় দেখবেন। আমি খাস দিলে তোমার জন্য দোয়া করি মা তোমার জন্য আমি একটা রোযা রাখব, কথা দিলাম।

বউটা কাঁদতে থাকে। মাষ্টার ধরে আসা গলায় আবার বলতে থাকে,

– মা, জীবনে যদি বাঁচি তোর বেটার মুখ দেখতে আসব। বউটা খুব কষ্ট করে বসে,

– মোফাজ্জেল মাষ্টারের পা ছুঁয়ে প্রনাম করে। আজ এতো বছর পরও সে বাগদি বাড়িতে সেই সন্তানকে দেখতে যেতে পারেনি মোফাজ্জেল। আজ তার মনে হয়, জীবনে অনেককে দেওয়া কথাই সে রাখতে পারেনি। তারপর, সেখান থেকে তারা চলে গিয়েছিল তেহট্ট। সেখানে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল তারা। একটা ভাঙ্গা ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটা ছেড়া পাটিতে শুতে হত তাদের। প্রতিটি রাত, প্রতিটি সকাল ছিল যন্ত্রণা আর সমস্যায় ঠাসা। প্রতিদিন দলে দলে মানুষ আসছিল এদেশে। রাস্তায়, স্কুলে, ষ্টেশনে, ফুটপাতে এমনকি গাছেও কালো কালো রুগ্ন আর ক্ষুধার্ত মানুষ। রাতদিন ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে ছেলেটা। ছোট মেয়েটা আফরোজার বুকের দুধ খেতে খেতে একসময় ক্লান্ত হয়। বড় ছেলেটা দু’টো ভাতের জন্য সারাদিন কাঁদে। দুপুর বেলা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে সাহা বাবুদের রান্না ঘরের দিকে। –এর মধ্যেই চলে গেল ঈদ-পূজা; শীত বর্ষা আর গ্রীষ্ম। তারপর একদিন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, বাংলাদেশ স্বাধীন। সব হারিয়ে এই চরম প্রাপ্তিতে মানুষ আনন্দে দিশেহারা হয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ছুটছে ফেলে আসা ভিটে মাটির টানে। –এসবই সে সময়ের কথা। চল্লিশ বছর পূর্বে তারপর দীর্ঘ সময়। পরিবর্তের দোলায় সব কিছু পাল্টে গেছে। পাল্টেছে মোফাজ্জেল মাষ্টার নিজেও। কিন্তু সারা জীবনে ভুলতে পারেনি অথবা ভুলতে চাননি জীবনের মূল্যবান নয়টি মাস। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। আর সেই লড়াই-সংগ্রামের হৃদয়

ছোঁয়া প্রকাশের স্মারক হিসাবে লিখেছে এক উপন্যাস 'ফিরে যাওয়ার গান'। আর এটি উৎসর্গ করেছেন তেহট্ট বাজারের পাশে সেই পরিবারটিকে, যারা সেদিন তাদের শান্তি সুখ বিনষ্ট করে মোফাজ্জেল মাষ্টারদের আশ্রয় দিয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মোফাজ্জেল সাহেবের মনে হয়েছে, এটি সেই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানই উপযুক্ত সময়। ৭১ -এর ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতার আনন্দে পিছনে ফিরে তাকানোর সময় পাননি মোফাজ্জেল মাষ্টার। আজ তেহট্ট বাজারের সেই সাহা পরিবারটির হাতে নিজের লেখা উপন্যাসটি তুলে দিয়ে, সেদিন আশ্রয় দানের জন্য তাদের প্রতি আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানাতেন তার কোলকাতা যাত্রা। মোফাজ্জেল মাষ্টার মনে করেন, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়েছে তার জীবনে, আর দেরি নয়; সময় ফুরাচ্ছে দ্রুত – আর সময় হয়তো নাও পেতে পারেন তিনি।

অচেনা এই বিভূঁই-এ মোফাজ্জেল সাহেব প্রথমেই ধাক্কা খেলেন তেহট্ট বাজারে। বাজারের এক কোনায় ছিল বিশ্ববাবু দোকান আর বিশাল বাড়ি। কিন্তু আজ সেই নিশানা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ; মাঝে আছে দীর্ঘ সময়ের ফাঁক। পাল্টে গেছে সব। ঠিকানাটা কিছুতেই যখন মিললনা, তখন মোফাজ্জেল সাহেব সাহায্যের কথা ভাবলেন। কিছুটা দূরে কতগুলো ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে। মোফাজ্জেল সাহেব অগত্যা তাদের দিকে এগুলেন। মোফাজ্জেল সাহেব বাংলাদেশ থেকে এসেছেন জেনে তরুনদের মধ্যে উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল মূহুর্তেই। বারবার বলার পরও কেউ কেউ মোফাজ্জেলকে প্রশ্ন করল, '–তাহলে তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেচ; ওখানে তোমাদের বাড়ি?---' এই বাঁধন হারা উৎসাহ মোফাজ্জেল সাহেবের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্থির উদ্রেগ করল। ছেলেরা মোফাজ্জেলকে সাহায্যের চেয়ে বৈষয়িক বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল–

– আচ্চা, কাকু আপনাদের ওখানে আলুর কিলো কত?

একজন বলল,

– তোমাদের জাতীয় নির্বাচনে নাকি রিগিং করে শেখ মুজিবের দলকে হারিয়ে দিয়েচে?

তাদের মধ্যে লম্বা একজন মসলা মুখে দিয়ে প্রশ্ন করে বসল,

– কাকু, আপনাদের দেশে ইলিশের কিলো কত এখন?

ইলিশের কথা উঠতেই আরো একজন বলে উঠল,

– জানিস তো, বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের টেষ্ট ব্যাপক, মাইরি বলচি, আমার ঠাকুমা বলেচে...। মুহূর্তে ওদের মধ্যে ইলিশ বিষয়ক আলোচনা বিস্তার লাভ করতে থাকে।

মোফাজ্জেল সাহেব আলোচনাটা আলগোছে শুনতে শুনতে লজ্জা বোধ করেন। ওরা বলতে থাকে,

– আরে বাংলাদেশে ইলিশ, মানে পদ্মার ইলিশ।

মোফাজ্জেল সাহেব গত বেশ কিছুদিন ইলিশ মাছ খাননি। শুধু তিনি কেন, ইলিশ এখন বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে। পদ্মা বন্ধা হয়ে গেছে। দুষ্ট মানুষ চারা ইলিশ চুরি করে ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত। তারপরও এদের ঠাকুমারা আজো সেই ফেলে আসা তুলসী তলার স্বপ্ন দেখে; আজো স্বপ্ন দেখে ভাজা ইলিশের গন্ধে মৌ মাতাল পাড়া গাঁ– মোফাজ্জেলের মনে হয়, থাকুক, ওরা সেই পূরনো ঘোরে, ঘোর কাটলেই তো সব মিথ্যা; ঘোর কাটলেই তো ইলিশ উজার হওয়া বিরান বাংলাদেশ।

আরো কিছুটা সময় হাওয়া হওয়ার পর মোফাজ্জেল সাহেব দেখা পেলেন বিশ্বনাথ বাবুর দূর সম্পর্কীয় এক ভাইয়ের। তিনি জানালেন সাহা বাবুরা এখন আর এখানে থাকে না। উনি ব্যবসা আরো বড় করে কোলকাতায় ফ্লাট কিনে এখান থেকে চলে গেছেন আজ বেশ কিছুদিন। বড় ছেলে চাকরি করে দিল্লী। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে আর ছোট মেয়ে কোলকাতার ভাল কলেজে লেখাপড়া করে –সুখের পরিপাটি সংসার।

মোফাজ্জেল সাহেব বিনীতভাবে তাকে বললেন,– উনার কোলকাতার ঠিকানাটা যদি দিতেন।

– নানা সেতো নিশ্চয়।

ভদ্র লোক একটা কাগজে ঠিকানা লিখে মোফাজ্জেলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর, একটা চায়ের দোকানে বসে চা-সিঙ্গাড়া খাওয়ালেন। মোফাজ্জেল সাহেব তাকে কোলকাতা পৌছানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করতেই ভদ্রলোক কোথা থেকে কোন বাসে উঠতে হবে তাও বলে দিলেন। ঘড়ি দেখে অতি উৎসাহের সাথে বলে উঠলেন,

– 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্ট্রেট বাস এসে পৌছাবে। নিন আর এক কাপ চা নিন; আমি আপনাকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরব।' ভদ্র লোকের এই ব্যবহারে মোফাজ্জেল সাহেব অভিভূত হয়ে পড়লেন।

যথাসময়ে স্ট্রেট বাস এসে পৌঁছাল। বিদায়ের সময় ভদ্রলোক গলাটা কিছুটা খাদে নামিয়ে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল,

– আচ্ছা দাদা, বাংলাদেশে নাকি এখন মুসলমানরা আবার হিন্দুদের কচু কাটা করছে,

গেল বার নাকি দুর্গা পুজো করতে দেয়নি মুসলমানরা!

এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় কি? মোফাজ্জেল সাহেব অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কি উত্তর করবে, আদৌ কোন উত্তর দেবে কিনা দ্রুত ভাবতে থাকে মোফাজ্জেল– আর তার মধ্যেই গাড়ির কনডাক্টর তাড়া নিয়ে ওঠে,

– দাদা তাড়াতাড়ি উঠুন, পাবলিক বাস।

সম্বিত ফিরে পান মোফাজ্জেল। তারপর বাসের মসৃন হাতল ধরে বাসে উঠে পড়লেন। বাস গড়াতে শুরু করে। ক্রমেই গাড়ির গতি বাড়ে। এক সময় ফাঁকা রাস্তা আর দুপুর কাঁপিয়ে স্ট্রেট বাস ছুটে চলে কলকাতার দিকে। গাড়ির দুলনিতে মোফাজ্জেল সাহেবের ঘুম আসছে। ঘুমের আর দোষ কি? ধকল গেছে খুব। তারপরও তিনি ঘুমাচ্ছেন না। বাসের জানালা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছেন রোদ মাখানো দুপুর। তার বারবার মনে হচ্ছে এই বিদেশী দুপুর; দুপুর আর তার দেশের চিরায়িত দপুরের সাথে সামান্যতম পার্থক্য নেই কোথাও। জানালার বাইরে অবারিত সবুজ মাঠ, যার উপর বাসের গতি ছাড়িয়ে পড়ছে। গাড়ির গতিতে গাছগুলো দুলছে –যেন মাথা নুইয়ে অভিবাদন করছে মোফাজ্জেল বি.এস-সি সাহেবকে। এখানে মাঠের পর মাঠ পাট চাষ করেছেন চাষীরা। মোফাজ্জেল সাহেবের কষ্ট হয়। বাংলাদেশে পাটের দাম নেই, কমছে পাটের আবাদ। এক সময়ের সোনালি আঁশ এখন চাষীর কাছে ধূষর ফাঁসে পরিণত হয়েছে। পাটকলগুলো বন্ধ কোন এক অদৃশ্য ঈশারায়। কিন্তু, এরা পাটকলগুলো চালু রাখতে পেরেছে। আর সে কারণেই মাইলের পর মাইল পাটের চাষ। দুপুর রোদে একদল ছেলেমেয়ে নদীতে খেলছে; কেউ কেউ মাছ ধরছে। দেশী মাছ। মোফাজ্জেল সাহেবের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় এখনকার ছেলে-মেয়েরা খালে-বিলে-নদীতে নামতে চায়না। তাছাড়া নদীতে পানিও নেই। আমাদের খাল-বিল এমনকি নদীও এখন ভূমি খাদকদের দখলে। নদীকে হত্যা করে তারা বুনেছে ধান অথবা তামাক। দেখার কেউ নেই। নিকেশ কালো অন্ধকারে বাস করতে করতে সকলেই যেন অন্ধ এখন!

গাড়ি যখন কোলকাতায় এসে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। কোলকাতার রাস্তায় জ্বলে উঠেছে হাজারো নিয়ন আলো। চারদিক ঝলমল করছে রঙ্গিন আলোয়। রাস্তা কাঁপিয়ে চলছে ট্রাক, ট্যাক্সি এ্যাম্বাসেডার, টাটা, সুমোসহ আধুনিক মডেলের গাড়ি আর ন্যানো। স্ট্রেটবাস থেকে নামার সাথে সাথেই মোফাজ্জেল সাহেবকে অনেকেই ঘিরে ধরলো। অনেকেই এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘দাদা ডলার ভাঙ্গাবেন নাকি, অন্যদের

থেকে আট আনা বেশী দোব, মা কসম' -এরা দালাল। আশ্চর্য এক উপায়ে এই দালালগুলো বুঝে গিয়েছে মোফাজ্জেল মাষ্টার বিদেশী এবং তার কাছে ডলার আছে।
তাই সাবধানে ভিড়টা পাশ কাটিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন একটা মাঝারি মানের হোটেলের সন্ধানে। রাতটা একটু নির্বিঘ্নে কাটিয়ে সকালে বিশ্বনাথ সাহার ঠিকানা খুঁজবেন তিনি। শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না। ধর্মতলার আর নিউ মার্কেটের পাশে একটা হোটেলের সিঙ্গেল বেডের এক কামরায় শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন। গোসল আর খাওয়ার পর ঘুমটা এলো বেশ জাঁকিয়ে।

২

নিউ কলকাতার আধুনিক এক শপিং মল সাউথ প্লাজার সামনে যোধপুর পার্কে কয়েকটা ফ্লাট পেরিয়ে বিশ্বনাথ সাহার ফ্লাট। তাজা রোদ মাখানো ঝকঝকে সকালে ঠিকানাটা যখন তিনি খুঁজে পেলেন তখন কলকাতা শহর কোলাহল মুখর। একে অন্যকে টপকে যাওয়ার পাল্লায় ব্যস্ত সবাই। কেউ কারো দিকে খেয়াল করছে না মোটেও। মোফাজ্জেল সাহেব মনে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এইরূপ তাচ্ছিল্য বোধকরি ইতর প্রাণীকুলেও নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোফাজ্জেল সাহেব বুকে ফু দিয়ে কলিং বেলে হাত ছোঁয়ায়।
মোফাজ্জেল সাহেব তার বুকের ধুকধুকানি স্পষ্ট অনুভব করেন। তার মনে হয় অনন্তকাল ধরে তিনি অপেক্ষা করছেন এক অচেনা জায়গায়, একা। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের ভিতর থেকে খরখরে গলায় উত্তর আসে 'আসছি'। আওয়াজ শুনে মোফাজ্জেল সাহেবের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। সামান্য পরে কাঙ্খিত দরজাটা খুলে একটা অল্প বয়সী মেয়ে হাতে ফুলঝাড়ু নিয়ে চোখে মুখে বিরক্তি আর হাজারো প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞাসা করল,
– কাকে চাই? কোত্থেকে এয়েচেন?
মোফাজ্জেল সাহেব ঠিক কোথা থেকে শুরু করবেন বুঝতে না পেরে দুম করে বলে উঠেন,
– বাংলাদেশ।
মোফাজ্জেল সাহেবের বেশ-ভূষা আর কথার টান শুনে মেয়েটি বুঝতে পারে, দরজার বাইরে অপেক্ষমান ভদ্রলোক বিদেশী এবং সম্ভবত বাংলাদেশী। অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটি বলে,
– আমি মাসীকে ডেকে দিচ্ছি; আপনি বসুন।
বলেই মেয়েটি দৌড়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল। কিন্তু মোফাজ্জেল সাহেবের ভিতরে বসার সাহস হলনা। তারপরও তিনি গলা বাড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগলেন। বেশ

গোছানো ঘর। আলমারিতে রবীন্দ্র রচনাবলীর পাশে শরৎ, জীবনানন্দ, সেক্সপিয়ার সমগ্র আরো কত কিছু। দেওয়ালে একটা 'টাইটান' ঘড়ি; একজনের শবযাত্রার ছবি বাঁধান। তারপাশে রবীন্দ্রনাথের বড় ছবি। একজনের সমাবর্তনের ছবি ...

মোফাজ্জেল সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, দেওয়ালে কোন দেব দেবীর ছবি নেই। মধ্যবিত্ত 'সাহা' বাড়ির দেওয়ালে কোন দেব দেবীর ছবি নেই। অথচ, মোফাজ্জেল দীর্ঘ সময় শুনে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত হিন্দুরা যারপরনাই ধার্মিক এবং সাম্প্রদায়িক। অথচ এদেশের মন্ত্রীরা একশো ধর্মগ্রন্থ হাতে ছুঁয়ে শপথ নিতে অস্বীকার করেন। এদেশে অনেকেই নিজেকে কমিউনিষ্ট পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। এ দেশের শিল্পীরা দেবীর নগ্ন ছবি আঁকতে দ্বিধা করেন না। এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম কাউকে চাপিয়ে দেয় না –তারপরও হিন্দুস্থানের মানুষ শুধুই হিন্দু।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের লীলাভূমি, দীর্ঘ বামপন্থি শাষণের বঙ্গ, এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখনো 'পানি' কথাটি সহ্য করতে পারেনা। জাতীয়তাবোধের নামে জ্যোতি বসুর দেশের মানুষ এখনো সেই প্রাচীন হিন্দুত্বকেই আঁকড়ে ধরে আছে হাজারো ক্ষেত্রে। অথচ, মোফাজ্জেল সাহেবের নিজের দেশে, এক সামরিক শাসক ইসলাম ধর্মকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করা সত্বেও ওখানকার মানুষ আজো ভীষণ বাঙালি। আজো তার গ্রামের বাড়িতে ঈদের দিনে নিজ হাতে তার প্রতিবেশী সুশীল চক্রবর্তী আর প্রচীপ চন্দ্র চন্দ্র বাবুকে দাওয়াত করে খাওয়ান। তারাও মোফাজ্জেল সাহেবের বাড়িতে তৃপ্তির সাথে খেয়ে মোফাজ্জেল সাহেবের কাছে জল চান আর মোফাজ্জেল সাহেব তাদেরকে পানি দেন। সেই পানি খেতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। অন্যদিকে তারাও দুর্গা পুজোয় অনেক আনন্দ করে মোফাজ্জেল সাহেব সহ অনেককেই তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে দ্বিধা করেন না। পহেলা বৈশাখে এই বাংলাদেশের রক্ষনশীল মুসলিম পরিবারের ছেলেরা ধুতি পরে বাঙালি ঐতিহ্যকে স্মরণ করে অবলীলায়। একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ রবীন্দ্রনাথকে 'হিন্দু কবি' বলে বিভাজন তৈরীর চেষ্টা করলেও বাংলাদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে 'বাঙালি কবি' হিসাবেই আপন করেছেন। কিন্তু এ্ই কোলকাতার অনেক শিক্ষিত মানুষ এখনো হুমায়ুন আহমেদ,শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হকের নাম জানেন না। অন্যদিকে সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ মজুমদার, পুর্ণেন্দু পৈত্রী বাংলাদেশের যুবকদের কাছে যৌবনের কবি-সাহিত্যিক। বাংলাদেশের মানুষ আজো মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত, সতীনাথের গান শুনে ভালবাসতে শেখে। লোপা মুদ্রা, শ্রীকান্ত আচার্য, নচিকেতা, সুমন, অঞ্জনদের নাম তরুন-

তরুনীদের মুখে মুখে। অথচ মোফাজ্জেল সাহেবের সন্দেহ হয়, এই কোলকাতার খুব কম তরুন হয়তো আব্দুল হাদী, জব্বার, কনকচাঁপা অথবা এন্ড্রু কিশোরের নাম জানে। কি নিদারুণ বৈষম্য 'জল' আর 'পানি'তে। মোফাজ্জেল সাহেবের মনে হয় রাজনৈতিক আর ভৌগলিক বিষয় কি পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে? না কি এর মধ্যে নিঃশব্দে মিশে আছে ঘৃণ্য জাতিগত ধারণা। এ যদি হয়, তাহলে এই মহামানবের সাগর তীরে দাঁড়িয়ে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠে মোফাজ্জেল সাহেবের। তৃষ্ণার বুকটা ফেটে যাওয়ার জোগাড় হয়। কিন্তু এই বাড়িতে 'পানি' চেতে সাহস হয় না তার। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, 'জল'-ই চাইবেন কিন্তু তার পূর্বেই ভিতর থেকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে 'বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ' করতে করতে এক মধ্যবয়সী মহিলা থপ্ থপ্ করে বাইরের ঘরে ঢুকল। চোখে মুখে হাজার জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রশ্ন করল,

– আপনি ?

গলাটা ভীষন শুকনো লাগছে মোফাজ্জেল সাহেবের। যথাসম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে কাপালের ঘাম মুছে গলাটা সামান্য ঝেড়ে সে বলল,

– ইয়ে মানে, আমার নাম মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, বাড়ি...

কথা শেষ না হতেই মাঝ বয়সী ভদ্র মহিলা বলে ওঠে,

– মুসলমান! বাংলাদেশ! বাব্বা! বাংলাদেশের কথা মনে হলেই ... ...। একথা বলেই মহিলা এমন ভঙ্গি করল যা মোফাজ্জেল সাহেবকে আহত করল। আহত কণ্ঠেই তিনি বললেন,

– বাংলাদেশ, মানে বাংলাদেশ –তাছাড়া আপনাদের এখানেও তো প্রচুর মুসলমান আছে, আছে না?

– না তা ঠিক আচে। কিন্তু সেই ৭১ সালে তোমরা (পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা প্রায়শঃ আপনি থেকে তুমিতে চলে আসেন সহজেই) এদেশটার যা হাল করেছিলে এক বছরে। মাগো! এখানে সেখানে 'ইয়ে' করে –রাস্তা ঘাট স্টেশন ইস্কুল ইস্ !

ভ্যাবাচেকা খেয়ে মোফাজ্জেল বলে ওঠে,

– না, না সে সব ঠিক আছে। আমরা সেদিন যুদ্ধ করছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমাদের সেই দুঃসময়ে আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন; আমরা কৃতজ্ঞ। আর সে সব দুঃসহ স্মৃতি আমার সমগ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই সব নিয়েই আমার এই বই 'ফিরে যাওয়ার

গান’। আপনাদের জন্য।

– বই? আমাদের জন্য? না না এই মাসের শেষে। তাছাড়া এই শহরে বাংলা বইয়ের কোন বাজার নেই– তা কত দাম করেচ?

লজ্জা আর অপমানে লাল হয়ে যায় মোফাজ্জেল। তারপর দৃঢ় গলায় বলে,

– না না, টাকা পয়সার বিষয় এটা নয়। এটা আমার কৃতজ্ঞতা; আপনারা সেদিন আমাদের যে সাহায্য করেছিলেন –কৃতজ্ঞতা তার জন্য।

খড়খড়ে গলায় মহিলা বলে উঠল,

– সে সাহায্য আর আমরা করলাম কোথায় - করল তো ইন্দিরা গান্ধী। যত ঝামেলা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে ... ... জাগ্‌গে সে সব, আপনি ভিতরে আসুন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মোফাজ্জেল ভিতরে ঢুকল। তার বুকে চলছে প্রপাত। বুকের মাঝে একটা যন্ত্রণা অনুভূত হয়। মুখটা ভীষন শুকনো লাগে তার; নিজের অজান্তে ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে বইটা স্পর্শ করে মোফাজ্জেল, যা তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতি আর গভীর মমতায় গড়া।

সাথে সাথে বোশেখ মাসে উত্তপ্ত দমকা বাতাসের মত ঘরে ঢোকে এক সতের আঠারো বছরের এক আধুনিক মেয়ে। জিন্সের প্যান্ট, শর্ট গেঞ্জি ঝলমলে চুলগুলো উচু করে বাঁধা, গায়ে মাদক লাগা সুগন্ধ হাতে আধ খাওয়া স্যান্ডইউচ। ঘরে ঢুকে মাকে সে জিজ্ঞাসা করে,

– মম্, হু ইজ হি ?

বিব্রত হয় মোফাজ্জেল। তাছাড়া এত আধুনিক পোষাকের মেয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে তার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। মেয়ের মা, অপরাধীর মত গলায় উত্তর দেয়,

– ইয়ে, জানিস তো, এঁর বাড়ি বাংলাদেশ ...

নিজেকে সামলে নিয়ে মোফাজ্জেল ভদ্র মহিলার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠেন,

– মা, তুমি আমায় চিনবে না। আমরা ’৭১ সালে তোমাদের বাড়িতে দীর্ঘ প্রায় এক বছর ছিলাম। তোমার চেনার কথা নয়; তখন তোমার জন্ম হয়নি।

মেয়েটি সপ্রতিভ হয়ে উত্তর করে,

– তোমায় চিনব না কেন? তোমার কথা কত শুনেছি। ইন ফ্যাক্ট, কোন কিছুকে চিনতে বা জানতে গেলে তা নিজের চোখে দেখতে হবে তার কোন অর্থ আছে কি ? হাও ফানি!

এই অকাট্ট যুক্তি মোফাজ্জেল সাহেবকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে দিল।

তারপরও ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সে বলে ওঠেন,

– না, তা তো ঠিকই।

কথাটা বলেই মোফাজ্জেলের মনে হল, সে খুব বোকার মত আচরণ করছেন। তারপর মনে পড়ে, ছোট বেলায় দাদী বলতেন, ‘ওরে মোফা, তোর চেহারাটা বড় বোকা বোকা’। কথাটা মনে হতেই আয়নায় তার নিজের চেহারাটা দেখতে ইচ্ছা হল। মেয়েটি তার হাতের স্যান্ডউইচ -এ আরো একটা কামড় দিয়ে গলায় চমৎকার ঝঙ্কার তুলে আবার বলে ওঠে,

– আপনার কতা অনেক শুনেচি। আপনাদের দু’টো ছেলে ছিল। ওরা ছোট লোকের মত সারাদিন ভাত ভাত করে শুধু চেঁচাতো ... ...

এই কথায় মোফাজ্জেলকে ট্যাঁটা বিধা সাপের মত মাটির সাথে গেঁথে ফেলে, তারপরও লজ্জিত হয় এ বাড়ির ভদ্র মহিলা। শত হোক অতিথি নারায়ন। ভদ্র মহিলা সত্যিই লজ্জা পেয়েছেন এবং তার মাঝেই চোরা চোখে মোফাজ্জেলের দিকে তাকাচ্ছেন। এই কথার কোন উত্তর হয়না। মোফাজ্জেলের কাছে এর কোন জবাবও নেই এই মুহূর্তে; তারপরও সে মিন মিন করে বলার চেষ্টা করে,

– মাগো, তোমার কথা সঠিক। কিন্তু আমাদের তখন দুঃসময় চলছিল মা। তাছাড়া সারা বছর আমরা ধানী জমির ভাত খাই। আর মাগো তারাও ছিল শিশু, ভাতের কষ্ট ওরা সহ্য করতে পারেনি ।

মোফাজ্জেলের চোখে চোখ রেখে মেয়েটি এবার বলে ওঠে,

– এখন তোমাদের সুসময় এসেছে ; মানে দুঃসময় কেটেছে। আই মিন, হ্যাভ ইউ গট বেটার টাইম?

এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর মোফাজ্জেলের কাছে নেই। প্রশ্নটা মোফাজ্জেলের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ভেদ করে, সমস্ত চেতনাকে একটা বড় ধাক্কা দেয়।

তার মনে হয়, সত্যিই কি তাদের দুঃসময় কেটেছে? অস্বিস্তিতে বাকরুদ্ধ হয়ে যান মোফাজ্জেল। আপাতত অস্বস্তি কাটাতে ভদ্র মহিলা এগিয়ে আসেন, বলে ওঠেন, “ওসব বাদ দে তো বন্টি; তোর দেরী হচ্ছে।” বলেই এই প্রথম বারের মত মোফাজ্জেলকে বসতে বললেন। তারপর বন্টিকে বোঝানোর স্বরে বললেন,

– জানিস তো, উনি বাংলাদেশের মাষ্টার মশায়। একটা বইও লিখেছে।

বন্টি জিজ্ঞাসার সুরে বলে,

– ওয়াট বুক ?

যন্ত্র চালিত খেলনা পুতুলের মত মোফাজ্জেল বলে ওঠে,– 'ফিরে যাওয়ার গান' মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস।

– বাংলা না ইংলিশ?

ভাষার লড়াইয়ের দেশের মানুষ মোফাজ্জেল বীরের মত বলেন, 'বাংলায় মা বাংলায়'। কথাটা বলে তার বড় গর্ব বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই শিকড়হীন তথাকথিত আধুনিক এই মেয়েটা জন্য এই উত্তরটার বড়ই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরক্ষণে মনে মনে লজ্জা পান তিনি। তার মনে হয়, এই একরত্তি মেয়ের সাথে তার মত একজন রিটায়ার্ড স্কুল শিক্ষকের 'পাল্লা' হতে পারে না। বন্টি বলে,

– ওহ নো! নো বডি লাইসক্ বাংলা; একচুলি দে ডোন্ট ফিল ইন্টারেস্ট টু রিড। আমিও পড়ি না- এজ আ মেটার অব ফ্যাক্ট, আই কান্ট রিড বাংলা। আই ক্যান টেল ইট আ বিট এ্যাজ মাদার টাঙ্গ। এখন ফিকশনের যুগ; ইংলিশ এর যুগ ...

মেয়েটা আরো কি সব বলে চলল, কিন্তু মোফাজ্জেলের কানে কিছুই ঢুকল না। মোফাজ্জেল আবার সকলের অলক্ষ্যে তার ব্যাগে রাখা বইটিকে ছোঁয়; তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি –যা এদের কাছে কোন মূল্য নেই –এই ইতিহাস, এত রক্ত দান –জীবন নিংড়ান অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই এখানে -এখানে চলছে ফিকশনের যুগ।

মোফাজ্জেল সাহেব লক্ষ্য করলেন, তিনি ঘামছেন। বাইরে মৃদু বাতাস বইছে, ঘরের ভিতরেও যে খুব গুমোট তাও না–– কিন্তু তিনি ঘামছেন। মোফাজ্জেল সাহেবের মনে হচ্ছে, তিনি বড় পুরনো হয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে তার এই গভীর বোধ ও আবেগের দিন ফুরিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের দেশের তরুন-তরুনীরা এখন বাংলা পড়ে না। তার জীবন কর্ষিত মুক্তিযুদ্ধ, তার কৃতজ্ঞতা, "তার ফিরে যাওয়ার গান" কে এই পরিবারটি একটি উটকো উৎপাত বলে গন্য করছেন। মোফাজ্জেল সাহেবের মনে হল বুকটা তার কারবালা হয়ে গেছে; মনে হল কয়েক যুগের তৃষ্ণা তার বুকে জমে উঠেছে এখন। কিন্তু তিনি এখানে কি চাইবেন 'পানি' না 'জল'? তার পানি বা জল কিছু চেতে ইচ্ছে হয় না শেষ পর্যন্ত...'

তীব্র হর্ণ বাজিয়ে একটা শিখ ছেলে তার ঢাউস মোটর বাইক নিয়ে দরজার প্রায় কাছে এসে থামে। মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে তেহট্ট বাজার থেকে উঠে আসা সাহা পরিবারের অষ্টাদশী মেয়ে বন্টি। দ্রুত কেডসে ফিতে বেধে ঝলমলে চোখে মা কে বলে,

– মম্ আমার ফিরতে লেইট হবে। উই হ্যাভ এ্যা নাইস পার্টি দিস্ ইভিনিং; সো বাই ...
বলেই বন্টি তার অপূর্ব রমনীয় শরীরে ঢেউ তুলে, সারা ঘরের মানুষগুলোকে নড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল এবং এক রকম ঝাপিয়ে পড়ল বাইরে অপেক্ষমান শিখ ছেলেটার বাইকের পিছনে।

হিপনোটাইজ মানুষের মত অথবা বন্টির বাইরে বেরুনোর গতির ঝড়ে বাংলাদেশ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আসা, তার প্রাণের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গভীর মমতায় লেখা উপন্যাস 'ফিরে যাওয়ার গান' –এর লেখক মোফাজ্জেল মাষ্টার বি.এস-সি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান সকলের অজান্তে। তখন কলকাতার বুকে পড়ন্ত দুপুরের আলো। মৃদু বাতাস ঝাপিয়ে পড়ে তার ঘামে ভেজা সর্বাঙ্গে। মোফাজ্জেল সাহেবের এই মুহূর্তে নিজেকে কোন মেলায় হারিয়ে যাওয়া শিশুর মত অসহায় বোধ করেন।

বন্টি শিখ ছেলেটার পিছনে বসে এবং তাদের মধ্যে হিন্দীতে আর ইংলিশে যা কথোপথন হলো তার বাংলা করলে এরূপ দাঁড়ায়,

– হায় বন্টি! তোমাকে দারুন দেখাচ্ছে! কিন্তু তুমি কি বিরক্ত? কি হয়েছে?

– আর বল না, বাংলাদেশ থেকে এক শরনার্থী এসেছে, বাংলা বই বেঁচতে, তাও আবার বাংলা উপন্যাস, মাই ফুট!

শিখ ছেলেটা আর দেরী না করে তার বাইকের সেলফ্ স্টাটারে হাত ছোঁয়ায় ; ওদের বোধ হয় তাড়া আছে...

পরক্ষণে স্বশব্দে বন্ধ হয়ে যায় সাহা বাবুর ফ্লাটের দরজা। এই অচেনা কোলাহল পূর্ণ শহরে মোফাজ্জেল সাহেব দাঁড়িয়ে থাকে একা। হঠাৎ তার বাড়ির কথা মনে পড়ে; মনে হয় অনেক দিন সে বাড়ি ছাড়া। মোফাজ্জেল সাহেবের মনে হয়, 'এখন দেশে ফেরার কি কোন ব্যবস্থা আছে?' -এই কথাটা তিনি এই মূহুর্তে কাকে জিজ্ঞাসা করবেন?...

জন্মদিন ও সামান্য ভুল

নিজের হাতের লেখার মুদ্রিত রূপে দেখে মাখন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তার নিজ এলাকা, মেহেরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'ঢেউ' -এ মাখনের কবিতা ছাপা হয়েছে। ছাপা হরফের মধ্যে যে এমন মহিমা লুকিয়ে থাকে তা তার জানা ছিল না। ছাপা হরফ গুলো পিট পিট করে মাখনের দিকে তাকিয়ে আছে। কবিতা লেখা অভ্যাসটা তার ঠিক কবে থেকে নিজের মধ্যে আসল এখন তা সঠিক করে বলা কষ্টকর। তবে, মাখন লেখে। কবিতা, ছড়া, গল্প কখনো বা গান। এই লেখার ঝোঁক ছিল মাখনের বাবার মধ্যেও। সারাদিন স্কুল মাস্টারী করে অবসরে লিখতেন কবিতা আর ছড়া; ছড়া গুলোর নিচে তার সাথে মিল করে আঁকতেন ছবি। মাখনের বাবা, নিপেন বাবুর একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিল একটা বই প্রকাশ করা। সরস্বতী পুজোতে পাড়ার শিক্ষার্থীরা যখন পড়ার বই নিয়ে দেবীর পায়ে দেওয়ার জন্য দৌড়া-দৌড়ি করত তখন নিপেন চক্রবর্তী দেবীর পায়ে জমা দিতেন তার কবিতার পান্ডুলিপি। তারপর একদিন হঠাৎ সব আশা আর হতাশা কে পিছে ফেলে নিপেন বাবু যখন নিরাপরাধ চারজন লোকের কাঁধে চেপে শ্মশানের পথে যাত্রী হলেন, তখন তার সম্বল মোটা ফ্রেমের চশমা, ময়লা ফতুয়া আর খাটো ধূতি। শ্মশানযাত্রীদের মুখে মুখে সেই চিরায়ত কবিতা "বল হরি, হরি বল।" যারা এই চরণ বললেন না, তার দূরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আহা লোকটা ভাল ছিল, ভাল কবিতা লিখত"! তারপর ধীরে ধীরে নিপেন বাবুর দেহ প্রথমে ধোঁয়া তারপর ছাই হয়ে অতীতের সুদূর অন্তরীক্ষে মিশে যায়। কিছুদিন পর, তার ফেলে যাওয়া কবিতার পান্ডুলিপি চলে যায় কাগজ ক্রেতার পাল্লায়। এভাবেই কবি নিপেন চক্রবর্তীর, স্বপ্ন সাধ আর কাব্য প্রতিভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুধু কেন জানি তার স্বপ্ন আর প্রতিভাটা প্রেতাত্মা হয়ে মাখনের মধ্যে থেকে গেল সকলের অলক্ষ্যে।

মেহেরগঞ্জের সাহিত্য পত্রিকার "ঢেউ" -এর সম্পাদক সাইদুজ্জামান সেন্টু দামী সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে যখন মাখনের লেখাটা তার চোখের সামনে ধরলেন, তখন মাখন তার সামনে চুপসানো বেলুন হয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খানিক বাদে, সহিদুজ্জামান সেন্টু চশমার উপর দিয়ে মাখনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাতের লেখা ভাল; ছন্দটাও মন্দ নয়; কবিতা আছে।" সব মিলিয়ে যে কি দাঁড়াল মাখনের বুঝে উঠতে আরো কিছুটা সময় লাগল। সেন্টু সাহেব, বললেন,

– তুমি কি নিয়মিত লেখ?

মিনমিন করে মাখন কি উত্তর করল, তা ঠিক বোঝা গেল না। সম্পাদক বললেন,

– আমার এই "ঢেউ" -এ ভাসতে ভাসতে অনেকেই এখন সাহিত্যের মহাসাগরে ভাসমান টাইটনিক। সেদিক থেকে এই পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে তোমাকেও অন্যদের মত একটা সুযোগ দিতে চাই...।

বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল মাখনের। এতক্ষন অস্বস্তির মহাসাগর হাল বিহীন নৌকার মত দুলছিল সে। মনে মনে স্বর্গীয় বাবার পারে একটা প্রণাম করল পরম ভক্তিতে। গর্বিত হল সে। কবির ছেলে কবি সে। এরকম ক'জনের ভাগ্যে হয়!

সেন্টু ভাই বললেন,

– যাও, তোমার কবিতাটা নিলাম আমার পরবর্তী সংখ্যার জন্য। তবে একটা কথা আছে–

আবার, মাখন পড়ল অস্বস্তির সাগরে। সেন্টু ভাইয়ের মত দুঁদে সম্পাদক মাখনের মত সামান্য তুচ্ছ একজনের সাথে কি শর্ত থাকতে পারে। এতক্ষন চুপছিল মাখন। কিন্তু এখন আর চুপ থাকলে চলে না; তাছাড়া এটা একটা অসম্মানের পর্যায়ে পড়ে। সামান্য কেশে গলা ঝেড়ে বলল,

– জ্বী বলুন, কি কথা....

– না না তেমন কিছু না; কিন্তু কথা হল 'খরচ'! এখন হল খরচের সময়। 'টাকা পয়সা' এমন একটা বিষয়, যে লোকে শুনলে সমালোচনা করে, কিন্তু একটা পেপার করা যে কত খরচ, তা যে করে সে জানে! সে কারণে, আমরা সকল লেখকদের কাছ থেকে মাত্র দুইশত টাকা করে নিয়ে থাকি।

কথা শুনে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসল মাখনের। মাখনের পেশা বলতে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু ছেলে মেয়ে। তাও আবার অনেকেই পয়সা দেয় না। সংসার চলে বাবার পেনশনে আর মায়ের কৃচ্ছতার সংগ্রামে। তার মধ্য থেকেই মাখনের কাব্য সাধনা। কিন্তু তার জন্য এই মধ্য মাসে দুইশত টাকা জোগাড় করা বেশ কঠিন। এ যেন অনাহারীর হাতে জমিদার বাবুর দেওয়া 'তাল'। তারপরও রাজি হয়ে যায় সে।

– কবে দিতে হবে?

– পারলে এখনই।

– এখন তো কাছে নেই, আমি দিয়ে যাব।

– আচ্ছা ঠিক আছে; তবে অবশ্যই প্রেসে যাওয়ার আগে দিয়ে দেবে, ঠিক আছে।

কথা আর হয় না দু'জনের মধ্যে। একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে মাখন হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে।

অনেক সাধ্য সাধনার পর তার লেখাটা যখন "ঢেউ" এর মধ্যপাতায় ছাপা হল তখন সেন্টুর প্রতি মাখনের কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ল। মনে হল, সেন্টু ভাই শুধু তার নিজের নয় তার বাবার ইচ্ছাও পূরণ করেছেন। সে না থাকলে মাখনের এ জনমে আর কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া হয়ে উঠত না। মাখনের মনে হয়, যুগে যুগে সেন্টুর মত মহান মানুষেরা ছিল বলেই কবিরা জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে মাখনের চোখে জল এসে যায়।

এরপর থেকে অবশ্য মাখনের লেখা 'ঢেউ' এর বেশ কটি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। সেদিন একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ অঞ্চলের খ্যাত নামা কবি, ফজলুল হক সিদ্দিকী নিজে থেকেই মাখনের কথা বললেন। তাকে কাছে ডেকে স্বস্নেহে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমার লেখা পড়েছি বেশ ভাল; তোমার মধ্যে কাব্য লুকিয়ে আছে। তবে প্রয়োজন চর্চার"। সেদিন মাখন আনন্দে আর আবেগে আপ্লুত হয়েছিল। পরে অবশ্য কিছু অহংকার বোধও তার মধ্যে দানা বেঁধে ছিল। মাখন বুঝতে পারে এগুলো তার কবি হয়ে ওঠার স্বীকৃতি। আনন্দে আন্দোলিত হয়ে ওঠে মন; আবার মনের মধ্যে শংকাও তৈরি হয়। তার বাবা ছিল কবি। কবিতা ছিল তার প্রাণে মনে; কবিতা ছিল তার চিন্তনে। নিপেন মাস্টার প্রায়স বলতেই, "কবিদের জীবন খুব যন্ত্রনার; আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিন কুলে কেউ বেঁচে নেই; কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের অর্ধেকটা ছিল যন্ত্রনা। আমাদের এই বাংলাতে এক কবি একুশ বছর বেঁচে ছিলেন মাত্র।"

এখন মাখনের মধ্যে শরতের মেঘের মত চিন্তা গুলো মাঝে মাঝেই উঠে আসে। তার মনে হয়, কেন তাঁদের জীবন এত যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে শেষ হল?

মাখনের বাবার জীবনও খুব কি গোছান ছিল? তিনিও দীর্ঘদিন বাঁচেননি। একটি পরিবারের প্রধান হিসাবে নিপেন মাস্টার কি সফল ছিলেন?– অন্য দিকে তিনি যদি কবি না হতেন তাহলে কি ব্যক্তি জীবনে খুব সফল হতেন... এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মাখন উদাস হয়ে যায়। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে হয় তখন। হঠাৎ মার কথায় সম্বিত ফিরে পায় মাখন।

– কি রে তোর হাতে ওটা কি বই, মাখন? স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগে মাখনের।

– পত্রিকা মা, সাহিত্য পত্রিকা।

– এই পত্রিকায় কি তোর লেখা কবিতা আছে না কি বাবা?

– তুমি কেমন করে বুঝলে মা? লাজুক স্বরে মাখন জিজ্ঞাসা করে।

সাদা শাড়িটার আঁচলটা টেনে ছেলের চোখে চোখ রেখে মা বলে, ‘তুই যে কবি হয়ে উঠেছিস তা কি আমি জানি না ভেবেছিস?” এবার মাখন লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠে। স্বাভাবিক ভাবে মার দিকে তাকাতে না পেরে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। মা মাখনের অবিন্যস্ত চুলে আদরের পরশ রেখে বলে,

– তোর বাবাও আমার কথায় এ রকমই লজ্জা পেতেন। আর আমি পেতাম মজা।

আমি কি কবিতা বুঝি? ওসব অনেক লেখাপড়ার বিষয়; তারপরও আমাকে ‘ও’ কবিতা শুনাত।” মাখন লক্ষ্য করল, মা কত সহজ তার চলে যাওয়া স্বামীকে ‘ও’ বলে সম্বোধন করছে। মাখন তার জামার হাতে চোখের জল মোছে। চোখের জল শাড়ির আঁচলে মোছে মাও।

– তুই তো তোর লেখা আমাকে শোনালি না কোন দিন! তার গলায় আদুরে অভিমান ঝরে পড়ে। মাখন আগ্রহী হয়ে বলে,

– তুমি আমার লেখা শুনবে মা?

– তোর কি মনে হয়?

মাখনের মনে হয় তার মা টেলিভিশনের নাটকের মত আধুনিক মায়েদের মত কথা বলছে। মাখনের ভাল লাগে। নিম্নবিত্ত পরিবারের এক বিধবা বৌ তার স্বামীর জন্য জমিয়ে রাখা প্রেম আর তার ছেলের কবিত্বের উপর নির্ভর করে নিভৃতে হয়ে উঠেছে আরো রোমান্টিক, হয়ে উঠেছে আরও আধুনিক আর একমাত্র ছেলের বন্ধু আর ভক্ত। হয়তো ইতিমধ্যে সে দেখতে শুরু করেছে এক স্বচ্ছল পরিবারের স্বপ্ন। তার কাছে মনে হয়েছে, কবি হলেই হয়তো তিন বেলা পেটভরে ভাত খাওয়া যায়; মাস গেলে দুটো টাকা আসে। মাখন তার সদ্য শেষ করা কবিতা পড়তে শুরু করে। পড়তে পড়তে মাখন আবার উদাস হয়ে যায়। কেন জানি মাখনের চোখে জল এসে যায়; গলাটা কেঁপে যায় বার বার। পড়া শেষে অন্যদিকে মুখ রেখে মাখন বলে,

– কেমন লাগল মা?

– ভাল!

– শুধু ভাল মা?

– না তা না, কিন্তু তোর বাবার লেখায় একটা গতি থাকত; কথায় মিল থাকত; আর তোমার লেখার কথা গুলো কেমন জানি শক্ত শক্ত......

কথা গুলো এক নিঃশ্বাসে বলে, মা এবার লজ্জা পায়। মাখনের ভাল লাগে মা হঠাৎ বেশ চঞ্চল হয়ে বলে, "এবার তোর জন্ম দিনে তোকে একটা উপহার দেব ভেবে রেখেছি।" মাখনের মনে পড়ে যায়, সামনে ০৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী তার জন্মদিন। মাসের এই দিনটা আসলেই বাড়ীর সকলেই কেমন যেন আনন্দমুখর হয়ে উঠত। মা ভোরে স্নান সেরে পায়েস রাঁধতে বসতেন। আজকের দিনে পায়েস হল পবিত্র খাদ্য। তারপর মাখনকে স্নান করিয়ে বসানো হত একটা আসনে। বড়রা তার মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। দুপুরে চলত প্রতিদিনের নিয়ম ভেঙ্গে ভাল খাওয়া। এমনটি চলে এসেছে মাখনের বাবার আমলেও। নিপেন চক্রবর্তীর মা তার মুখে তুলে দিয়েছেন ভাল খাবার, মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে করেছেন আশীর্বাদ। চেয়েছেন তার দীর্ঘায়ু। অথচ বাবা দীর্ঘায়ু হননি। বয়সীগণ বাবার মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন তার সকল ইচ্ছা পুরণের জন্য– অথচ তার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয়নি। মাখনের মনে হয়, নিম্নমধ্যবিত্তদের কোন কিছু পূর্ণ হয় না। এরা শুধু ঈশ্বরের গুন কীর্ত্তন করে; সব কিছু ভবিষত্যের হাতে বন্দক বেঁচে থাকে শূন্যতায়। জীবন শেষে ঝাঁপ দেয় আবার এক শূন্যতায়। শূন্য থেকে আবার শূন্যে। – এবার আর এসব করতে ইচ্ছা হয় না মাখনের। এই আকাশ পাতাল অভাবের মধ্যে বাড়তি কিছু খরচ করতে একবারেই মন সাঁয় দিতে চায় না। সব সময় কি এক নিয়মে জীবন চলে? মাখন বলে,

– এবার এসব থাক মা।

– কোন সব? --- মা-র গলায় বিস্ময় ঝড়ে পড়ে। মাখনের উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। মাখন আবার উদাস হয়ে যায়। মা আবার বলে,

– বুঝেছি, খুব বড় হয়ে গেছিস না বাবা?

– তা না মা, এই সময়ে এত গুলো বাড়তি খরচ!

– ও তুই ভাবিস না; আমি কিছু পয়সা জমিয়ে রেখেছি।

মাখন বুঝতে পারে, মা তার ছেলের জন্মদিনে ঈশ্বরের কাছে সন্তানের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করবেন। ঈশ্বর শুনছেন কি শুনছেন কি না শুনছেন তাতে কিছুই আসে যায় না। সকলেই প্রতিনিয়ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করে চলেছেন এই পরিবারটির সার্বিক মঙ্গলের জন্য। অথচ জেদী ঈশ্বর, গোঁয়ারের মত নির্বিকার। অন্যদিকে নিপেন বাবুর নিরীহ

সংসারটি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে সেই পন্ডিত মশাইয়ের তিন পেয়ে কুকুরের মত। এর জন্য, এই পরিবারের সদস্যদের তার কাছে কোন অভিযোগ তো নেই-ই বরং আছে অপার কৃতজ্ঞতা-- বেঁচে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা। হোক না তা নির্মম, নিষ্ঠুর তারপরও তো বেঁচে আছে!

এরপর কিছুটা মাখনের জ্ঞাতার্থে, কিছুটা তার অগোচরে জন্মদিনের প্রস্তুতি চলতে থাকল। অন্য দিকে এলাকা সহ আশপাশের জেলাতেও একটা দুটো করে কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল। বাতাসে ভাসতে লাগল প্রশংসা ছোট-বড় সাহিত্য পত্রিকাগুলোর পাতায় নবীন প্রবীন কবি সাহিত্যিকগণের পাশে স্থান পেতে লাগল তরুন কবি মাখন চক্রবর্তীর কবিতা। মাখনের ধারণা ছিল, কবিতা কেউ পড়ে না। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, দৈনিক খবরের কাগজ পড়ার মত না হোক, কিছু মানুষ আছে যারা কবিতা পড়ে। আর এভাবেই 'ধ্যাত ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরের' মাখন লাজুক পায়ে সাহিত্য চর্চার পথে হাঁটতে শুরু করল।

ঘটনাটা ঘটল মাখনের জন্মদিনের মাত্র ক'দিন আগে। দুপুর বেলা। তখনও মাখনের শিক্ষার্থীরা এসে পৌঁছায়নি। আর সেই ফাঁকে মাখন কিছু সময়ের জন্য লেপের ওম্ নেওয়ার জন্য লেপের নিচে নিজেকে গলিয়ে দিয়েছে মাত্র। চিঠিটা দিয়ে গেল মাখনের মায়ের হাতে। ঝকঝকে অফসেট খামের চিঠি। তার ওপরে মুদ্রিত আছে মাখনের নাম। প্রথমে মাখন ভেবেছিল, তার প্রতি বিরুপ ঈশ্বর বোধহয় সদয় হয়েছেন। তার বোধহয় চাকরি হয়েছে। কিন্তু, পরক্ষনে তার আগ্রহটা আরো উবে গেল, প্রেরকের ঠিকানাটা দেখে। প্রেরক, কবিতীর্থ, রাজশাহী।

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠির মুখটা ছিড়ে পড়তে থাকে মাখন। পড়া শেষে এই মাঘের শীতে ঘামতে থাকে সে। খুব জল তৃষ্টা পায় তার। মনে হয় বুকটা শুকিয়ে চৈত্রের চৌচির হওয়া মাঠ হয়ে গেছে। গলায় আশংকা নিয়ে মা জিজ্ঞেস করে,

– কিসের চিঠি রে মাখন? কোন উত্তর না দিয়ে মাখন চিঠিটা মায়ের হাতে দেয়। কঠিন শব্দে লেখা অফসেট কাগজের চিঠি মা পড়ে এর অর্থ করতে পারবে না– মাখন তা জানে; তারপরও তার হাতে তুলে দেওয়া।

– তুই বল চিঠিতে কি আছে?

– মা, এঁরা আমাকে সম্মাননা দেবেন? পুরস্কার দেবেন আমার কবিতার জন্য।

মার চোখ মুখ চকচকে হয়ে ওঠে। অকারণেই সে আবার চিঠিটা হাতে তুলে নেয়। যত্নে;

তারপর বলে,

– কত টাকা দেব?

– এটা টাকার বিষয় না। বিষয়টা হল সম্মানে।

মা একটু দমে গেলেও বলে, "তাহলে তো ভালই" কবে যেতে হবে ? চিঠির তারিখটা নিয়ে বেধেছে ঝামেলা। কবিতীর্থ, সংগঠনটি কবি সাহিত্যিকদের সম্মাননা প্রদানের তারিখ বির্ধারণ করেছেন। ১৮ জানুয়ারী, মাখনের জন্ম দিনে। তারিখটা শুনে মায়ের বুকে একটা হাহাকার বয়ে গেল। মূহুর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ধুপের ধোঁয়া, দূর্বা, বেল পাতা সাজান পূজার থালা, পায়েস, আর শূন্য আসন। এবার প্রথম থেকেই জন্মদিন পালনে গড়িমসি ছিল মাখনের; মার চোখের কোনায় জল জমতে শুরু করেছে, শাড়ির কোনায় চোখটা মুছে স্বাভাবিক গলায় মা বলে, "তাতে কি? যাবি, অবশ্যই যাবি, এত বড় আয়োজন!"

মূহুর্তে মাখনের চোখের সামনে ভেসে উঠে, সাজান গোছান বিশাল মঞ্চ, অনেক বিদগ্ধ মানুষ, সাউন্ড সিস্টেমে সুরোলিত কণ্ঠের উপস্থাপনার মাঝে লাজুক ও গর্বিত মাখন তার কবিত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করতে এসেছে সূদুর মেহেরগঞ্জ থেকে। কবি মাখন রাজশাহী যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিয়েই নিল।

দুই

মাখন রাজশাহী পৌঁছাল সকাল দশটা বাজার আগেই। সে যখন স্নান সেরে তৈরি হচ্ছিল তখনও সকালের আলো ভালভাবে ফোটেনি। অপেক্ষাকৃত নতুন জামা পড়ে বাবার ছবিতে প্রণাম করতে গিয়ে মাখনের চোখের কোনা ভিজে ওঠে। তার কপালে পবিত্রতা আর শুভর প্রতিক দইয়ের ফোঁটা দিয়ে মা যখন আশীর্বাদ করে বিদায় দিতে এলেন, তখন মায়ের নিঃশব্দ কান্না দেখে মাখনের গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কান্না নিজের মধ্যে চেপে মাখন মা কে বলেছিল, "কাঁদছ কেন মা? তুমি কি ছেলে মানুষ?" মা শাড়ির আঁচলে চোখে মুছে সাথে সাথে। মা গর্ববোধ করে। তার ছেলে পুরস্কার আনতে যাচ্ছে। মাখনের জানতে ইচ্ছে হয়, রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল আনতে গেলেন তখন কি তাঁর মা বেঁচে ছিলেন? আর থাকলে তার মা কি আনন্দে কেঁদে ছিলেন? এ সব আবল-তাবল ভাবতে ভাবতে মাখন গাড়ীতে উঠে। তারপর গাড়ীর দুলুনিতে তার দু'চোখ ভেঙ্গে আসে ঘুম। এই ঘুমের মধ্যে মাখন দ্যাখে, শান্ত চারপাশ। মাখন কে ঘিরে আছে কবিরা। পরীক্ষা

হচ্ছে তার। লিখতে হবে কবিতা– যা হবে 'কালজয়ী' এবং লিখতেই হবে। কিন্তু তার মনের মধ্যে সাজানো শব্দ গুলো হঠাৎ উড়ে গেছে কোথায়! হাতড়ে ফিরছে মাখন; মিলছে না; কিছুতেই না; ঘামছে সে। দিশেহারা অবস্থায় গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে তার। কিন্তু লেখা তো শেষ করতেই হবে। মাখনের চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে দ্রুত। হঠাৎ ফিসফিসানি কানে আসে তার। সচকিত হয়ে মাখন লক্ষ্য করল, একদল পিঁপড়ে সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ওদের প্রত্যেকের মুখে একটি করে নতুন জ্বলজ্বলে শব্দ। ... ... আচমকা ব্রেক কষতেই মাখন জেগে উঠে। গাড়ীর লোকেরা চিৎকার করতে থাকে, "রাজশাই রাজশাই, লাবেন, লাবেন, বেগ লিয়ে লাবেন। আকস্মিকতা কাটতেই এক রোমাঞ্চ তাকে গ্রাস করে। কবি মাখন এখন রাজশাহীতে।

গাড়ী থেকে নেমে একটা রিক্সা নিয়ে কবিতীর্থ পৌঁছাতে খুব বেশী বেগ পেতে হল না মাখন কে। কবিতীর্থ সমগ্র আয়োজনটি করেছে স্থানীয় একটা কলেজে। আয়োজন দেখে মাখনের দু'চোখ চড়ক গাছে উঠে গেল নিমেষেই। এত বিশাল আয়োজন চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কলেজের উপর তলায় কবি সাহিত্যিকদের রাত্রি যাপনের আয়োজন; খাওয়ার আয়োজন নিচে। চা জল খাওয়ার ব্যবস্থাও এই কলেজের বারান্দায়। সুদর্শন ছেলে মেয়েরা গলায় রঙিন ফিতেই কার্ড ঝুলিয়ে হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক। কর্মচাঞ্চল্যে চারদিক গমগম করছে। লাউড স্পিকারে সুরলিত কণ্ঠে ভেসে আসছে ধারাবিবরণী। আর এর মধ্যে সর্বত্রই চলছে সাহিত্যের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা সাহিত্য রসিকগণ আড্ডা দিচ্ছেন। এই চকচকে পরিবেশ গ্রামের শ্যামলিমার গন্ধ মাখা কবি মাখন এক গামলা ঝোলের মধ্যে সিদ্ধ না হওয়া আলুর মত ভাসতে থাকে। ভাসতে ভাসতে মাখন একটি ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় যার গায়ে বড় করে লেখা "অভ্যর্থনা" ইংরেজিতে "রিসিপসন"।

মাখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘরের ভিতরে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে চমৎকার এক যুবক খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল,"

– আপনি কাকে চাইছেন? কিছু বলবেন?

হতচোকিত হয়ে মাখন বলে,

– আমি মাখন চক্রবর্তী, মেহেরগঞ্জ থেকে আসছি। এই যে চিঠি। যুবকটি মাখনের হাত থেকে চিঠিটি দ্রুত গ্রহণ করে। তারপর নিবিড় ভাবে মাখনের দিকে দৃষ্টি রেখে বিড় বিড় করে কিছু বলতে থাকে। অপ্রস্তুত মাখন বলে,

– কিছু বললেন?

– না মানে, তেমন কিছু না, আপনি আসুন, বসুন।

অপরিচিত লোকের এই আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয় মাখন। আসলে এঁরা বিদ্যান, বিদুষী ব্যক্তি; এঁরা আছেন বলেই তো এই দেশে এখনো সত্য ও সুন্দরের চর্চা হয়। বিদ্যা বিনয়ং দদাতি ... ...

সুসজ্জিত চেয়ারে বসে মাখন তৃপ্তি বোধ করে। যুবকটিকে টেলিভিশনের সংবাদ পাঠকের মত দ্যাখাচ্ছে। মাখন চুরি করে যুবকটিতে দেখতে থাকে। যুবকটি মুখ চমৎকার একটা হাসি এনে বলে,

– আপনি চিঠিটা কবে পেয়েছেন?

– এই তো ক'দিন হল।

– ওখানে আমাদের একটা ফোন নম্বর দেওয়া ছিল, একবার ফোন করলে আর এ সমস্যা হত না।

– কি সমস্যা? এখানে কোন সমস্যা হয়েছে কি?

যুবক আর কথা না বাড়িয়ে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠে। তারপর বলে, "আপনি চা খানঃ আমাদের সেক্রেটারী স্যার কে খবর দিয়েছি। উনি প্রধান অতিথি নিয়ে ব্যস্ত। এখনই এসে যাবেন। তখন কথা হবে।" বলেই চলে গেলেন পাশের ঘরে। তার কিছুক্ষন পড় একটি ছেলে চা আর ক'টি বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল,

– স্যার, আপনি নাস্তা খেয়েছেন? আমাদের এখানে কিন্তু নাস্তার ব্যবস্থা আছে।

ছেলেটার মুখে স্যার কথাটা শুনে মাখনের লজ্জা লাগলেও গৌরবে বুকটা ভরে উঠে। "না না ঠিক আছে, ঠিক আছে।" তার ইচ্ছে হল ছেলেটাকে ডেকে কিছু কথা বলে; কিন্তু সেটা বোধহয় উচিৎ হবে না। কারণ এখানে সকলেই ব্যস্ত দাম্ভিক ভঙ্গিতে চলছে সকলে; এখানে সবাই রাজা!

চা খেতে খেতে মাখন আবার উদাস হয়ে যায়। ভাবতে থাকে নানান কিছু। তার বাবার কথা, তার জন্মদিনের কথা, মায়ের কথা আর কবিতা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। এর মাঝেই প্রবেশ করেন, বিশালদেহী এক ভদ্রলোক। তার গলায় ফিতে কার্ড বুলানো নেই। চশমা আর পাঞ্জাবীতে তার ব্যক্তিত্ব এক মোহনীয় স্তরে পৌঁছেছে। জলদগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন,

– আপনি মেহেরগঞ্জ থেকে এসেছেন, তাই না? মূহুর্তে মাখন বুঝে নিল, এই

ভদ্রলোকটিই সেক্রেটারী।

– জ্বী হ্যাঁ।

– আমি ইসমাইল হোসেন রাজা। এই আয়োজনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদক আর এই কলেজটির অধ্যক্ষ– বলেই ভদ্র লোক তার সোনালী রংয়ের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে সামান্য অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছেড়ে শীতের আকাশের গভীর নীলের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যান। আর তখুনি মাখনের মনে পড়ে চিঠির নিচে এই নামটি লেখা ছিল। ইনি যদিও ড. ইসমাইল হোসেন রাজা, তারপরও মুখে পরিচয় দেওয়ার সময় 'ডক্টর' শব্দটি উচ্চারণ করলেন না। মাখনের মনে হয় আজো আমাদের সমানে মহান মানুষের অভাব নেই। বেশ কায়দা করে সিগারেট ধরিয়ে একবুক ধোঁয়া ছেড়ে ডক্টর ইসমাইল হোসেন রাজা নিরবতা ভাঙলেন। আর সেই সাথে মাখনও অস্বস্থি থেকে মুক্তি পেল। রাজা সাহেব বললেন,

– সামান্য ভুল হয়ে গেছে। ওদিকে আবার আমাকে সবাই খুঁজবেন।

মাখন বিনয়ের সাথে বলে,

– না না ঠিক আছে। এত বড় আয়োজন ভুল তো হতেই পারে

– আপনি যদি একটা ফোন করতেন তাহলে … …

চিঠিতে একটা ফোন নাম্বর ছিল। তা ছিল, কেউ না আসতে পারলে জানানোর জন্য। কিন্তু মাখন তো আসবেই।

ড. ইসমাইল হোসেন রাজা বললেন,

– অবশ্য আমি ওকে, মানে ঐ ছেলেটাকে আচ্ছা করে বকাবকি করেছি। সেও খুব লজ্জিত হয়েছে। 'তোমারৎ সরি আপনার ফোন নম্বর না থাকায় ও যোগাযোগ করতে পারেনি….

মাখন তাড়াতাড়ি বলে উঠে,

– স্যার, আমাকে 'তুমি' বললেই খুশী হব। স্যার আমি কি জানতে পারি কোন ভুলে আপনি এত বিব্রত?

সামান্য নিঃশ্চুপ থেকে ড. রাজা দাম্ভীক কণ্ঠে বলেন,

– না মানে, 'নাম' টা ঠিক ছিল, ঠিকানাটা ছেপেছে ভুল। মাখন চক্রবর্তী নামে আমাদের মানে সমসাময়িক কবিতা ও সাহিত্যাঙ্গণে একজন বিখ্যাত কবি আছেন; কিন্তু ঠিকানার স্থলে তোমার ঠিকানাটা কিভাবে ছাপা হল সেটাই আমি ভাবছি এখনো…।

ভেজা পাঠখড়ির গন্ধ মাখা কবি মাখন চক্রবর্তী এবার বুঝে গেছে ভুলটি কোথায়। মূহুর্তে চোখের সামনে তার মার অবসাদ গ্রস্থ চেহারাটা ভেসে উঠল। দূরের নীল আকাশটা কে মাখনের এখন খুব দূরের মনে হচ্ছে না। ঢোক গিলতে গিয়ে মাখন বুঝতে পারে তার মুখটা তেঁত হয়ে আছে। শ্বাস নিতেও সামনে কষ্ট হচ্ছে– ঘরটা খুব গুমোট হয়ে উঠেছে মূহুর্তে; গাড়ীর দুলুনিটা এখনও গাছে লেগে আছে বলে মনে হচ্ছে মাখনের; সাথে ডিজেলের গন্ধ মেশানো বমি বমি ভাব। মনে হচ্ছে এখনই ভেতর থেকে সবকিছু পাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে। আর চারপাশে অখন্ড নীরবতা। ড. রাজা সাহেব নীরবতা ভাঙলেন

– কি করবে মাই বয়? টু আর ইজ হিয়ুম্যান। অন্যদিকে কবিদের ভ্রমণ খুব প্রয়োজনীয়। তোমার সামান্য বেড়ান হল। নিঃশ্চয় খুব বোর হচ্ছিলে গ্রামে---

এর মাঝে চমৎকার একজন একটা খাম এনে সম্পাদক মহোদয় কে বলল, "স্যার খামটা এনেছি।" সম্পাদক সাহেব তাকের চোখের ইশারায় টেবিলের উপর রাখতে বললেন। তারপর বললেন, ভ্রমণ এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। একদিকে এক্সিডেন্ট অন্য দিকে গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি। এই দেশটা বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না। তবে, তুমি লেখ ভাল। ছাড়বে না, চালিয়ে যাবে। আর এই খামটা রাখ। এতে তোমার যাওয়ার ভাড়াটা আছে। ভাল কথা, তোমার কোন কন্ট্রাক্ট নম্বর থাকলে অবশ্যই দিয়ে যাবে– আগামীতে আমরা তোমাকে আমন্ত্রণ জানাব। এখন আমাকে উঠেতে হচ্ছে– বুঝতেই তো পারছ– এত বড় আয়োজন....।

বাড়ি ফেরা

গাড়ির হেড লাইট অফ হতেই আশ পাশের জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন, দীর্ঘ প্রতিক্ষারত যাত্রীর মত হুড় হুড় করে গাড়ির ভিতরটা কে গ্রাস করল। এমনিতেই নাইট কোচের ভিতরটা সাধারণত অন্ধকার থাকে। তারপরও আঁধারের মধ্যে কোথা থেকে যেন ভেসে আসে আলোর পাতলা রেখা। কিন্তু এখন কোচের ভিতরটা নিকষ অন্ধকারে টাসা। গাড়িটা আর গড়াচ্ছে না এখন। অচেনা-অজানা কোন এক জায়গায় থেমে আছে পরাজিত সৈন্যের ফেলে যাওয়া বিদ্ধস্ত গাড়ির মত। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে সময় দেখে নেয় আব্দুর রহমান স্নিগ্ধ। এগারোটা পনের। 'স্নিগ্ধ' কে আব্দুর রহমান হিসেবে পরিচয় দেওয়াই ভাল। শরতের এক স্নিগ্ধ সকালে তার জন্ম তাই, মা তার ছোট ছেলের নাম রেখেছিল স্নিগ্ধ। প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যন্ত স্নিগ্ধ নামটা আব্দুর রহমানের সাথে জোড়া হয়ে থেকেছে– কিন্তু ঢাকায় আসার পর 'স্নিগ্ধ' নামটা উবে গেছে। দলের জ্যেষ্ঠ কর্মী ভাইয়েরা বলেন, 'স্নিগ্ধ' শব্দের সাথে কেমন যেন ধুপ ধুপ গন্ধ আছে; আর একটু বাংলা নিয়ে আদিখ্যেতাও লেগে আছে; তা ছাড়া আব্দুর রহমান -এর থেকে ভাল নাম কি আর হয়!" সেই থেকে স্নিগ্ধ মুছে গেছে, আছে মোঃ আব্দুর রহমান। মোবাইলের স্ক্রিনের আলোতে আব্দুর রহমান তার সহযাত্রীর আতংকিত মুখটার কিছু অংশ আলগোছে দেখে নেয়। গাড়িতে যাত্রী সকলেই আতংকিত ও উদ্বিগ্ন! পিছনের দিকে এক যাত্রী উঁচু গলায় বলে উঠে,

এই মিঞা, যাও না ক্যান? শামুকের পিঠে চড়লেও তো এতক্ষন ঘাট পৌঁছাতাম। এই ড্রাইভার বিষয়টা কী?

আচমকা এই আওয়াজে কোচের ভিতরে কোন এক সিটে এক শিশু কেঁদে উঠে। স্বামীটা চাপা কণ্ঠে স্ত্রীর প্রতি খেঁকিয়ে উঠে,''দুধ দাও, দুধ! ক্ষুধা লেগেছে। একটা বাচ্চা সামলাতে পারে না, যত্ত সব ফালতু মহিলা''....

ড্রাইভারের কোন ভাবান্তর না হলেও এগিয়ে যায় গাড়ির সুপারভাইজার পিছনের সেই যাত্রীর কাছে। বলে,

- গাড়িটা যে চলবে, কিন্তু ক্যামনে? জানেন না হালার ব্যাটা হালারা হরতাল দিছে। এক কুটি টাকা দামের গাড়ি! একডা ইটা মারলেই কাঁচডা যাইব– হ্যারপর আছে যাত্রী গো

জানমাল!

– তাই বলে, আমরা কি এখানে চুপচাপ বসে থাকব? তাছাড়া হরতাল তো কাল থেকে শুরু–

– হ কাইল থিক্যাই তো কিন্তুক একছান তো শুরু অইচে রাইত থিক্যাই– অত্ত তাড়া থাকলে নাইম্যা রাস্তায় ফেলা গাছের গুঁড়ি গুলায় একটু হরাইয়া দ্যান, পঙ্খীর লাহান উইড়া যামুগা....

দেশে হরতাল চলছে। আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল শুরু হচ্ছে কাল থেকে। সরকার বাধা দিলে হরতাল হবে বাহাত্তর ঘন্টা; প্রয়োজনে আরো বেশী। একটি গণতান্ত্রিক দেশে হরতাল একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। তাছাড়া এই হরতালের পিছনে যুক্তি আছে বলেই মনে করে হরতাল আহব্বানকারীরা। একটি প্রচলিত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে রাজনীতি করে আসছে; নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, আসন পাচ্ছে– যারা দেশে সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়– তাদেরকে নিষিদ্ধ করার পক্রিয়া করছে সরকার। মুরুব্বী বুজুর্গ দের কে বিচারের প্রহসন করে তাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার পাঁয়তারা করছে ক্ষমতাসীন দল– আর সে কারণেই আব্দুর রহমানের দল হরতাল ঢেকেছে সারা দেশ জুড়ে।

এ সময় আব্দুর রহমানের ঢাকা ছেড়ে আসা ছিল প্রায় অসম্ভব। অনেক কাজ, পার্টি অফিসে। সে নিজে মহানগরের একটা ওয়ার্ড কমিটির হোমরা চোমড়া একটা পদে আছে। উপরের 'ভাইয়েরা' তার কাজে ও দায়িত্বে সন্তুষ্ট। এভাবে চলতে থাকলে সামনের কাউন্সিলে আরো বড় পদ অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু, আসতে হল খবরটা পেয়ে। ফোন করেছিল মিঞা ভাই। জুম্মা নামাজের পর। স্বাভাবিক গলায় শুরু করলেও কথার মাঝে মিঞা ভাই, মুবিন উদ্দিনের গলাটা ধরে এসে ছিল। ধরা গলায় মিঞা ভাই বলল, 'আব্বা আর থাকবে না রে স্নিগ্ধ; বোধ হয় তোর জন্যই অপেক্ষা করছে। সকল আত্মীয় সজনকে ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে। তুই রাতের গাড়িতে উঠেপর।' উত্তরে আব্দুর রহমান শুধু বলেছিল, 'ইনশাআল্লাহ'।

মিঞা ভাই, মুবিনউদ্দিন পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব না। দেশ, বিদেশ, রাজনীতি কোন কিছুর মধ্যে নেই সে। মাঠ ঘাট আর সামান্য মজুত দারীর ব্যবসা ছাড়া সে কোন দিকেই নজর দেয় না মোটেও।

কিন্তু এ অবস্থায় আব্দুর রহমান কি করে পার্টি অফিস ছেড়ে বাড়ি যায়! এটা কি

সম্ভব? কিন্তু আব্বা মৃত্যু শয্যায় প্রহর গুনছে! পার্টির জ্যেষ্ঠ ভাইরা শুনে তাকে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। স্পেশাল গাড়ি দিয়ে পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তারা। তাদের মূল দলের ছাত্র শাখার সহ সভাপতি তৌহিদ ভাই বললেন,

– আব্দুর রহমান, তুমি অবশ্যই যাবে। আমরা গাড়ি করে দিচ্ছি। প্রতিটি জেলায় আমাদের লোকজনদের বলে দিচ্ছি, কোন অসুবিধা হবে না, ইনশাআল্লাহ। অসুবিধা যে হবে না, তা আব্দুর রহমান জানে। তাদের দলের হাত এখন অনেক অনেক লম্বা। তারপরও সে স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মতই বাড়ী যেতে চেয়েছে। এবার তার পাশের সিটে বসা যাত্রীটি খুব উদ্বেগের সাথে বলল,

– মেহেরগঞ্জে কি পৌঁছাতে পারব ভাই?

– না পারার কি আছে?

– না মানে স্টুপিড গুলো হরতাল দিয়েছে দেখছেন না? আচ্ছা বলেন তো ভাই, হরতাল, ভাংচুর, মানুষ মারা ছাড়া কি অন্য কোন উপায় নেই? আরে ওরা তো চলে বিদেশী পয়সায় আর জীবন যায় আমাদের মত ছা'পোষা মানুষ দের।

– আগামী কাল আপনার কি কোন কাজ আছে?

– ভাই, কাল আমার একটা ভাইবা আছে।

হেলপার এসে খবর দিল, ''সামনে ব্যরিকেট দিয়েছে হরতালকারীরা গাছ ফেলেছে পথে; বেশ কিছু গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গেছে তার। কাঁচের টুকরো তে মহিলা ও শিশু সহ পাঁচজন আহত; একজন শিশুর অবস্থা বেশ খারাপ''। তবে আশার কথা হল এই, পুলিশ আসছে। গাছের গুঁড়ি সরানো হলেই গাড়ি চলতে শুরু করবে।

গাড়ির ভিতরে এক অস্বস্থিকর নীরবতা। এই নীরবতা ভেঙ্গে কিট কিট করে কারো মোবাইল বেজে ওঠে। ভদ্রলোক ক্ষিপ্র হাতে মোবাইল টা অন করে, কানে লাগিয়ে কথা বলে উঠে,

– আমি রওনা হয়েছি, হ্যালো, হ্যালো, পৌঁছাতে পারব কি না জানি না; রাস্তায় বহুত ঝালেমা; হ্যালো, হ্যালো বেবীর অবস্থা কেমন? হ্যালো হ্যালো ... . ধ্যাৎ নেট নাই। শালা এটা কি একটা দেশ! সব শালাদের র‍্যাব দিয়ে ব্রাস করে ... .

একটু মুখ বাড়িয়ে আব্দুর রহমান তাকে জিজ্ঞাসা করে,

– নেট পাওয়া যায় না ভাই?

– আরে ভাই, আমার ছোট বোনটার সিজার হয়েছে আজ দুপুরে। দুপুর থেকে মা আর

বাচ্চা দু'জনই ক্রিটিক্যাল। তার মধ্যে এই ব্যাটাদের হরতাল– বলেন তো কোন মানে হয়?

– কিন্তু সরকারেরও একটি গণতান্ত্রিক দলের উপর খড়গহস্ত হওয়া তো উচিৎ নয় ; এই দেশে সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই করা অন্যায় কিছু নয়।

এতক্ষনে গাড়ির ভিতরের অন্ধকার সবার চোখসওয়া হয়ে গেছে। আর সেই চোখসওয়া আলোতে ভদ্র লোক বেশ সতর্ক চোখে আব্দুর রহমান কে পর্যবেক্ষন করতে লাগলেন। আব্দুর রহমানের গেঞ্জি, খাটো জিন্সের প্যান্ট, কেডস্, ছোট চুল, আর মুখে হালকা দাড়ি, দেখে নিজের মধ্যকার আবেগ মূহূর্তে চেপে বলে উঠলেন,

– তা তো বটেই, তা তো বটেই। তা তাছাড়া আমি রাজনীতি বুঝি না ভাই; আমি সাধারণ মানুষ। চাকরী করি ভাত খাই; আমার অত কী!

লোকটি এই আলোচনা এবং আলোচক কে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হওয়ার অভিনয় করতে লাগলেন। আব্দুর রহমান বুঝল, লোকটি তাকে এড়াতে চাচ্ছে। আজ দুপুরে, যখন সে পার্টির ছেলেদের ব্যানার, গজারীর লাঠি, ট্যায়ার, চার লিটার অকটিন বুঝিয়ে দিয়ে বাংলা মটোরের মেস বাসা থেকে বেড়িয়ে রিক্সা খুঁজছিল, তখনও রিক্সার মামারাও তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। । সে প্রথম রিক্সাওয়ালা কে খুবই নিরীহ গলায় বলে,

– মামা যাইবেন?

– নাহ্

পাঁচ-ছয় জনের কাছে প্রত্যাখিত হয়ে, যখন আব্দুর রহমান বেশ বিরক্ত এবং কিছুটা হতাশ, ঠিক তখনই দুই রিক্সায়ালার কথপোকথন কানে আসে তার।

– য়ই, যাস না ক্যালা?

– নাহ যামু না।

– ক্যালা?

– চুতমারানীর পোলারা একছানে নামছে; এদিক সেদিক লয়া, হালারা গাড়ি ডারে জ্বালাইয়া দিব ... হালার পো হালা তো দলের পোলা ... . বুঝস্ না?

আব্দুর রহমান নিজের সম্পর্কে অন্যের ধারণা নিজ কানে শোনে আর হতাশ হয়– মনে মনে ভাবে এরা নিজেদের ও আখেরাতের ভাল সম্পর্কে চিন্তা করে না। এদের মধ্যে দ্বীনের এলেম নেই বলেই এটা সম্ভব। এইসব অশিক্ষা, বেদ্বীন শিক্ষা, অপসংস্কৃতি,

পরদেশী সংস্কৃতি দূর করতেই, তার রাজনীতি। আব্দুর রহমানের পরিবারের কেউ রাজনীতি করেও না বোঝেও না। এই পরিবারটি চাষাবাদ আর ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আব্দুর রহমান ছোট থেকেই ছিল একনিষ্ঠ ধার্মিক। আর তা হয়েছিল তার পাড়ার প্রাইমারী স্কুলের এক সহকারী শিক্ষকের একান্ত সহচর্যে এসে। তারপর দীর্ঘ পথচলায় আজ সে এখানে।

কিন্তু, আজ এত ব্যস্ততা, ক্ষমতা আর ঝুঁকির মধ্যে আব্দুর রহমানের মনে হয়, সঠিক পথে চলছে তো সে? সাধারণ মানুষের পরমার্থিক মঙ্গলের পাশাপাশি ইহজাগতিক বিষয়াবলি কে কি এত সহজে তাচ্ছিল্য করা যায়! মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এসে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না তো সে! সাধারণ মানুষের এত অসহযোগিতা কখনো কখনো ঘৃণা– এসবের মধ্যে কি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে কখনো! কিন্তু বর্তমান সমাজের চলমান সবকিছু কে কি মেনে নেওয়া সম্ভব?– এসব ভাবতে গিয়ে আব্দুর রহমান কিছুটা উদাস হয়ে যায়। গাড়ির জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে বাইরের অন্ধকারে। অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলো যেন মাথায় অন্ধকারের ঝুড়ি নিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে; গাড়ির ভিতর থেকে দেখে মনে হচ্ছে এরাও আতঙ্কিত, উদ্বিগ্ন। নাইট কোচের অসহ্য নিরবতা সহ আশপাশের জমাট নিরবতা কে খান খান করে কোথা থেকে একটা এ্যাম্বুলেন্স তার ভৌতিক লাল আলো আর রক্তজল করা তীব্র সাইরেন বাজিয়ে ছুটে যায় কোথায় যেন। সচকিত হয়ে উঠে সকলেই অজানা আশংকায়! গাড়ির সকলেই এ্যাবুলেন্সটার দিকে তাকিয়ে থাকে; দেখা যাচ্ছে না। তারপরও অনেকেই তাকিয়ে থাকে। তাদের সকলের মনে বিষন্ন চরের মত প্রশ্ন জেগে ওঠে– কিন্তু কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না; যেন উত্তর সকলেরই জানা। এর মাঝেই হেলপার দৌড়ে এসে বলল,"গাড়ি বাড়ান ওস্তাদ; রাস্তা সাফ; পুলিশে ডাউন দিছে; জলদি লন।"

ড্রাইভার এতক্ষন তার ক্লান্ত দেহটা তার সিটে এলিয়ে দিয়ে একটু তন্দ্রা উপভোগ করছিল। হেলপারের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে গাড়ির ইগনেশনে মোড়া দেয়। গাড়িটা সামান্য ঝাঁকি দিয়ে স্টার্ট নেয়। গাড়ির যাত্রীরা সকলে নড়ে চড়ে বসে। আব্দুর রহমান আবার তার মোবাইলে সময় দেখে নিল। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার সাথে সাথে পিছন সিটের যাত্রীটি বেশ জোড়ে দোয়া পড়ে উঠে,''লা ইলাহা ইলা আন্তা সুবানাকা ইন্নাকুন্ত ... ...

কোচের ভিতরের কোন এক আসন থেকে এক বুড়ি তার নাতিকে ডেকে বলে, ''গোবিন্দ,

ও গোবিন্দ গাড়ি তো ছেড়ে দিল রে, আমার প্যাট তো ফাটার জো .... আমি তো আর পারছি নে ....

ক্রমেই গাড়ির গতি বাড়ছে। গাড়ির ভিতর নিরবতা। রাস্তার সাথে গাড়ির চাকা ঘর্ষনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে হু হু। সুপার ভাইজার নিজের কাজের জন্য বাংকার লাইট জ্বেলেছে। সেই আলোতে গোটা কোচটাকে একটা জলন্ত চাইনিজ রেস্টুরেন্টের মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভার বলে উঠে,

– য়ই, শামসু, গান লাগা; গান হুনতে হুনতে যাই গা।

– নাহ ওস্তাদ, মনডা ভাল না! গাড়ির চালক উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

– ক্যান রে, কি অইছে?

– আর কন ক্যান ওস্তাদ, ইটা খাওয়া বাচ্চাডা মরছে; মাথায় কাঁচ ঢুকছিল; বেরেনের ভিতরে আঘাত লাগছিল মনে লয় ... ...

কথাটা আব্দুর রহমানের কানে পৌঁছে যায়। আবার গাড়িটা শব্দ শূন্য হয়ে পড়ে। শুধু আব্দুর রহমান বিড় বিড় করে দোয়া পড়ে,

– ইন্নাইল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন..........

দুঃখ প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ করে সুপারভাইজার বাংকার লাইট অফ করে দেয়। কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে কোচের ভিতর। সাথে জমাট অন্ধকার। বিভীষিকাময় নিস্তব্ধতা নিয়ে চলন্ত কবরের মত কোচটা এগিয়ে চলে মেহেরগঞ্জের উদ্দেশ্যে।

০২

যে কোন পরিস্থিতিতে যে প্রাণীটি খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারে, সে হল মানুষ। এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও আব্দুর রহমানের সহযাত্রীটি ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুমন্ত নিষ্পাপ মুখটা খুব সহজেই আব্দুর রহমানের ঘাড়ে এলিয়ে পড়ে। শুধু সে কেন, কোচের প্রায় সকলেই ডুব দেয় নিশ্চিন্তের ঘুমে। কিন্তু নিজ বিছানা ছাড়া কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না; আব্দুর রহমানের তাছাড়া দীর্ঘ দিন টেনশনের মধ্যে থেকে তার ঘুমটা অনেক হালকা হয়ে গেছে; তারপরও সে তার নিজের সিট টা আরো খানিকটা পেছনে হেলিয়ে দিল। আর আব্দুর রহমান চোখ বুঝল সামান্য ঘুমের আশায়। ক্রমেই তার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। আব্দুর রহমানের মন সংযোগ নষ্ট হয় বাবা দলিলউদ্দিনের ডাকে। দলিল উদ্দিন উদার কণ্ঠে ডাকছেন তার আদরে ছোট ছেলেকে,

“স্নিগ্ধ, ও স্নিগ্ধ আয় বাবা, দেখ তোর জন্য কি নিয়ে এসেছি!” আব্দুর রহমান আসে না।

বাবা দলিল উদ্দিন আবার ডেকে উঠেন,

"আয় স্নিগ্ধ ঘুড়ি ওড়াই; তোর জন্য লাটাই এনেছি সাথে ময়ুরকণ্ঠী ঘুড়ি! আয় বাপ বেটা মিলে ঘুড়ি ওড়াই।" এবার উচ্চ গলায় উত্তর দেয় আব্দুর রহমান,

– না আব্বা, আমি এখন পড়ছি; কেতাব পড়ছি।

– সারাদিন কি অত পড়িস বল তো? শুধু পড়লেই হবে? খেলাধুলাও তো করতে হবে– লাটিম খেলা, গোল্লাছুট, ঘুড়ি খেলা। ও স্নিগ্ধ দেখে যা, আকাশে পাঁজা পাঁজা তুলো মেঘ– অপূর্ব চারপাশ!

– নাহ আব্বা, সুন্দর পৃথিবী, প্রকৃতি সবই তাঁর দান। এই সুন্দর সময় খেলার জন্য নয় এবাদতের! আব্বা, আমি এখন এবাদত করব।

– স্নিগ্ধ ও স্নিগ্ধ, তুই কি পাল্টে যাচ্ছিস বাবা? আমি তোকে চিনতে পারছি না যেন!

– না আব্বা, আমি 'স্নিগ্ধ' নই। এই শব্দটার মধ্যে বাংলার আদিখ্যেতার মেশান। আমি মোঃ আব্দুর রহমান। আমার সময় নেই। আমি বড় ব্যস্ত এখন। আমি ... .

গাড়িটা একটা বড় ব্রেক কষতেই হন্তদন্ত হয়ে জেগে উঠল আব্দুর রহমান। গাড়িটা থেমে আছে। চারপাশ কোলাহল পূর্ণ। সবাই কথা বলছে। একসাথে। তন্দ্রার ধাক্কায় প্রথমটা আব্দুর রহমান বুঝতে পারল না, সে কোথায় আছে। সামান্য পর সে বুঝল, সে এখন ফেরী ঘাটে। কিন্তু ফেরী নাই। এপাড়ে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। এক হকার বলল, "দৌলতপুর ঘাটে হরতালকারীরা ফেরী ঠেকায়ে দিছে"। গাড়ির সকলেই আবার হতাশার আকূল পাথারে হাবুডুবু খেতে শুরু করে। পিছনের সেই যাত্রী ভীষন বিরক্ত হয়ে সামান্য কথাতেই চিৎকার করছে; মোবাইল করা ভদ্রলোক আরো বার কয়েক মোবাইলে বাড়ির সাথে কথা বললেন। বুড়ির অবস্থা আর খারাপ, তিনি প্রাণ পনে চিৎকার করছেন, "গোবিন্দা, ও গোবিন্দ...।

এর মধ্যে ঘাটের ফেরিওয়ালা গুলো তাদের জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে চারগুণ। কিছু কম বয়সী ছেলে যন্ত্রচালিত নৌকা করে নদী পাড় হওয়া ঠিক হবে কি না তা নিয়ে জটলা করছে। ওদেরও বোধ হয় পরীক্ষা আছে। প্রাইমারী অথবা স্বাস্থ্য বিভাগে কিংবা জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে অথবা অন্য কোথাও। আব্দুর রহমানের পাশের যাত্রীটি অধিক শোকে পাথর হয়ে একা একা ঘুড়ছে গাড়ি থেকে নেমে। আব্দুর রহমানের মনে হচ্ছে, সকলকে বুঝায় যে, একটি গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ দেশ তৈরির জন্য অথবা এই নাস্তিক সরকারের কবল থেকে দেশ ও এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে রক্ষা করতে হরতাল

গুরুত্বপূর্ণ– কিন্তু ঘাটের প্রায় সকলেই এই অরাজক পরিস্থিতির বিরোধীতা করছে। আব্দুর রহমান লক্ষ্য করল, তার পাশের যাত্রীটি নিজের চিন্তা ভুলে, গাড়ির শিশু বাচ্চাটিকে পায়খানা করাছে। শিশুটির মা গাড়ির ঝাঁকি আর ডিজেলের গন্ধে বোমি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আব্দুর রহমানেও ইচ্ছা হচ্ছিল, মহিলাকে একটু সাহায্য করে, কিন্তু কোন বেগানা মহিলার সাথে কথা বলা ঠিক না! গাড়ির সারি বড় হয়েই চলেছে। আব্দুর রহমান গাড়ি থেকে নেমে সব কিছু না দেখার দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে, আর মনে মনে ভাবছে, ''এবার 'হরতাল' জমছে ভাল; আগামীকাল পুলিশী এ্যকসান বাড়বে; ছেলেদের নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন... আব্দুর রহমান একটা দোকানের সামনে একটা ছোট জটলা দেখে থেমে দাঁড়ায়। দোকানদার কাউকে বোঝাচ্ছেন,

"কোন চিন্তা করবেন না ভাই– আল্লাহ'র নাম নেন; মনে রাখবেন, ফালা ফালি যত হোক, জালেমের শক্তি সব সময়ই কম।" কথাটা শুনেও না শোনার চেষ্টা করে আব্দুর রহমান। এসব পাত্তা দিতে নেই। বড় একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে গেলে অনেকেই অনেক মন্তব্য করবে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না কিছুই; তাদের পথ বড়ই কঠিন! দুর্বলতার কোন সুযোগ নেই!

হঠাৎ-ই যেন স্থবির হয়ে পড়া মানুষ গুলোর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল। খবর এসেছে, 'দৌলতদিয়া থেকে পুলিশ প্রহরায় ফেরী ছেড়েছে। সাধারণ মানুষও নাকি ফেরী ছাড়তে প্রশাসনকে সাহায্য করেছে। এই কথাটা পদ্মার এই পাড়ের মানুষের মাঝে অদ্ভুত কিছু একটা সঞ্চার করল। এ পাড়ের সাধারণ মানুষও মূহুর্তে প্রতিবাদী হয়ে উঠল। প্রশাসনের সাথে যুক্ত হল। অনেকেই মন্তব্য করে বসল, ''কুনু চিন্তা নাই; দ্যাশটা কি মগের মুলুক আইচে নি''! উপস্থিত স্থানীয়রা এই কথায় হৈ চৈ করে উঠল। কিছুক্ষনের মধ্যে মাঝ নদীতে তিনটি তীব্র সার্চ লাইট দেখা দিল। সে আলো পদ্মার ঘোলা ঢেউয়ের উপর পড়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে তিনটি ফেরী মোচার খোলের মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। আর তার আশে পাশে পাঁচ ছয়টি যন্ত্র চালিত নৌকায় পুলিশের সাথে সাধারণ মানুষ। পাহাড়া দিয়ে ফেরী গুলো পৌছে দিচ্ছে। এ যেন, যুদ্ধ জয়ের দৃশ্য; যা দেখা গিয়েছিল ১৯৭১ সালে।

আব্দুর রহমানের কোচ যখন নদী পাড় হল তখন বিষন্ন চাঁদ তার অপরূপ সৌন্দর্যের পশরা মেলে ধরেছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ঠিকরে পড়ছে এই ঘুমন্ত চরাচরে। গাড়ি প্রায় উড়ে চলেছে। ড্রাইভার স্টেয়ারিং এর উপর ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে

কোচ টাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর তাকে ভীষন ভাবে সহযোগিতা করে চলেছে হেলপার শামসু।

উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে গাড়ির সকলেই আবারো অসাড় হয়ে পড়েছে। আব্দুর রহমানের দু' চোখ বন্ধ; সে চোখে ঘুম নেই, আছে ক্লান্তি। ক্লান্তি আছে সবারই, তবুও এই যাত্রা। সকলেই বাড়ি ফিরছে। যেখানে প্রিয়জনেরা অপেক্ষা করে আছে। আব্দুর রহমানও বাড়ি যাচ্ছে। বাবা মৃত্যু শয্যায়! – যার কাঁধে চড়ে রথের মেলায় গিয়েছে সে, যার হাত ধরে হাঁটা শিখেছে। যিনি নিজ হাতে লাটাই বানিয়ে দিয়েছেন তার ছোট ছেলে সিগ্ধের জন্য– এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার ছোট বেলায়, বাবার গায়ে পা না দিলে সিগ্ধের ঘুম আসত না– সেই বাবা আজ অসহায় ভাবে প্রতিক্ষা করছে। অসহায় আব্দুর রহমান নিজেও! ছুটে যেতে পারছে তার বাবার কাছে, যার গায়ের গন্ধ এখনো আব্দুর রহমান পায়। ইদানিং সেই অতি পরিচিত গন্ধটা পারিপার্শ্বিকতাকে ভেদ করে তার কাছে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হয়।

গাড়িটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। ড্রাইভারের মোবাইল ফোনে নির্দেশনা আসল। তারা বলল, ঝিনাইদহ প্রবেশ করা যাবে না। সেখানে ব্যরিকেট আছে; বাইপাস দিয়ে আসতে হবে।" গাড়ি বাইপাস রোডে টার্ণ নিল। পাহাড় সমান উৎকণ্ঠা নিয়ে কোচটা ঝিনাইদহ পাড় হয়ে আরো একটা জেলা অতিক্রম করল অতি সন্তর্পণে। ইতিমধ্যে গাড়ির যাত্রীও অনেক কমে এসেছে। বিভিন্ন স্থানে নেমে গেছে যাত্রীরা। এখন গাড়িতে আব্দুর রহমান সহ দশ বারোজন যাত্রী। সকলেই ঠিকানা মেহেরগঞ্জ। গাড়ি যখন মেহেরগঞ্জের প্রবেশ মুখে তখনো ফজরের ওয়াক্ত আছে। যাত্রীরা গাড়িতেই ফজরের নামাজ আদায় করতে গিয়ে অনাগত দিন আর অতীত স্মরণ করে চোখের জলে ভাসলেন। ড্রাইভার সাহেব বললেন,

– আর চিন্তা নাই আমরা আইস্যা গেছি প্রায়।

কিন্তু নতুন করে ঝামেলাটা বাধল মেহেরগঞ্জ প্রবেশের ঠিক মুখে। রাজেন্দ্রনগরে। গাড়ি থেমে গেল হঠাৎ। সুপারভাইজার এসে বলল, ''গাড়ি আর যাবে না ভাই। সামনে ব্যরিকেট। এই দ্যাখেন ....

সকলেই দু' চোখে আতংক নিয়ে দূরের ব্যরিকেট, ট্যায়ারের আগুন সাথে ধোয়া দেখতে পায়। উৎকন্ঠিত অনেকেই এর জন্য ফেরী ঘাটের অব্যবস্থাপনাকে গালি দিয়ে উঠে।

সুপারভাইজার পুনরায় বিনয়ে সাথে বলে, ‘‘আমি একটা আলগামন ঠিক করে দিচ্ছি, ভাড়াও দিয়ে দিচ্ছে আপনারা এতে করে যান গা; আশা করি ঐ শালারা আলগামন কে আটকাবে না”। সকলেই ভেবে দেখে, এছাড়া উন্নত আর কোন পথও খোলা নেই। সকলেই রাজি হয়ে যায়।

আলগামন সামনের দিকে যত এগুতে থাকে, অবরোধকারীদের শ্লোগান প্রানহিম করা সাইরেনের মত যাত্রীদের অন্তর আত্মা কাঁপিয়ে তোলে। যাত্রী বোঝাই আলগামন দেখে ছুটে আসে অবরোধকারীরা। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, ইট আর কারো হাতে রাম দা। এরা এই এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মী। রাজনৈতিক কর্মীদের এই বিভৎস মূর্তি দেখে, নিরীহ যাত্রীবৃন্দ আতংকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কেবল, বুড়ি, চিৎকার করতে থাকে,”

– ও গোবিন্দা, গোবিন্দ ....

ওরা ছুটে এসে আলগামনের চালককে প্রথমেই একটা চড় কষাল। অন্য একজন কি মনে করে, গোবেচারা গোবিন্দ- কে এক চড়। বুড়ি এবার কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, ‘‘ও বাবা রা আমাদের জানে মারিস নি; আমরা সুযোগ পেলেই ওপাড় চলে যাব; এবারের মত জীবনটা ভিক্ষা দেন বাবা রা.....

তখনো সুবহে শাদীকের স্নিগ্ধ বাতাস থামেনি, সাথে জড়িয়ে আছে নাম না জানা ফুলের গন্ধ। দু’একটা পাখি ডাকতে শুরু করেছে মাত্র। হঠাৎ আব্দুর রহমানের ভিতরটা তেঁত হয়ে উঠে। মায়া হয় গোবিন্দের প্রতি। তার মনে হয়, এই অসহায় যাত্রীরা তার দিকে চেয়ে আছে; আর সেই দৃষ্টিতে ঝড়ে পড়ছে প্রত্যাশা ধিক্কার, ঘৃণা আর অভিশাপ। আব্দুর রহমানের আবার সেই ডাকটা সে শুনতে পাচ্ছে যেন স্নিগ্ধ .... ও .... স্নিগ্ধ.... আয় বাবা, রথের মেলায় যাই ... . ও স্নিগ্ধ তোকে চিনতে পারছি না কেন ... .

শান্ত ধীর স্থির আব্দুর রহমান মূহুর্তে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে,

– নাহ, থামো তোমরা!

ছেলে গুলো চিৎকার করে দলীয় শ্লোগান দেয়। ওদের মধ্যে একজন বলে, “এক শালা সামনে যেতে পারবি না। জানিস না হরতাল! সারা দেশ অচল করে দেব!” বলেই সমস্বরে দলীয় শ্লোগান দিয়ে উঠে। আলগামন থেকে নেমে আব্দুর রহমান ওদের দিকে এগিয়ে যায়; বলে,

– থামো, থামো তোমরা, এভাবে না। এভাবে হবে না। গোবিন্দ দের এদেশ থেকে

তাড়ানো আমাদের লক্ষ্য নয়; ওরা এদেশের মানুষ … ….
এর মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠে,

– এই শালা বেদ্বীনের শেখানো ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শেখাতে চাচ্ছে। অন্য একজন বলে উঠে, ‘‘শালা, শাহাবাগের চর। নাছারা! কাফের, নাস্তিক!

– মার শালাকে … ….

আর কেউ দেরী করে না। দু’তিন জন মূহুর্তে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। লাঠি রড আর কিল ঘুষিতে মূহুর্তে রক্তাক্ত আব্দুর রহমান সকালের শান্ত পিচ রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে। চারদিকের নানা শব্দের মধ্যে আব্দুর রহমান শুনতে পায়, বুড়ি চিৎকার করছে,

– ও গোবিন্দ, ও গোবিন্দ ছেলেটাকে তো ওরা মেরে ফেলল! ওকে বাঁচা!…

আব্দুর রহমানের সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। রামদাওয়ালা একটা কোপ দেওয়ার বাগ পাচ্ছে না কিছুতেই। তবে চেষ্টা করে চলেছে প্রাণ পনে। তবে বসে নেই অন্য ভায়েরা। আলগামনের অসহায় যাত্রীগুলো কেউ ব্যাগ নিয়ে আর কেউ বা ব্যাগ ফেলে দৌড় দিল প্রাণ ভয়ে। বুড়ি চেঁচাতে লাগল আরো জোড়ে। প্রায় সাথে সাথে সেখানে পৌঁছে যায়, ওদের নেতা। মোটর সাইকেলে। শান্ত সৌম চেহারায় আকাশী রংয়ের পাঞ্জাবী তে তাকে দেবদূরের মত দেখাচ্ছে। নেতা আসেতই ছেলেরা চাবি দেওয়া পুতুলের মত সরে দাঁড়িয়ে বলে, ‘‘আস সালামুআলাইকুম’’

মোটর সাইকেল থেকে নেমেই সে আহত আব্দুর রহমানের কাছে গেল। আর এদিকে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা নতুন হুকুমের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকল। নেতা সকলকে ভৎসনা করে উঠলেন,

– একি করেছ তোমরা? এ আমাদের লোক কেন্দ্রীয় নেতা রহমান ভাই। রহমান ভাই আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত; আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি। কোন অসুবিধা নেই, ইনশাল্লাহ।

লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ছেলেরা এগিয়ে এসে দাঁড়ায় নেতার পাশে। সকলকে অবাক করে, সব যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে আব্দুর রহমান চিৎকার করে বলে উঠে,

– না …. না আমি স্নিগ্ধ; আমি তোমাদের কেউ না; আমি সাধারণ মানুষ। আমাকে মার … …. মার ….. তোমরা…

তার গগন বিদারী এই চিৎকারে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক ঝাঁক পাখি কিচমিচ করে ডেকে উঠল। আতংকে না আনন্দে বোঝা গেল না …. …..

দীনেন্দ্রনাথ রায় এর একটি ঐতিহাসিক বিবরণের ছায়া অবলম্বণে অন্তহীন যে উপাখ্যান

খানিক এপাশ ওপাশ করে, পালঙ্ক ছেড়ে উঠে পড়লেন দোর্দন্ড প্রতাপশালী 'মল্লিক' পরিবারের বর্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নব কৃষ্ণ মল্লিক, ওরফে মেজ মল্লিক। ঘুম না আসলে অযথা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা খুবই অস্বস্তিকর। চারদিক ঘুমন্ত হলেও সামান্য দু'একটা শব্দ এই বিশাল বাড়ীতে সারাক্ষনই হয়। এখনো হচ্ছে সাথে কারো চাপা কণ্ঠস্বর। নবকৃষ্ণ মল্লিক উঠেই কিছুই সময় নিলেন ধাতস্থ হতে; তারপর সুধামায়ার ঘুমন্ত মুখের দিকে কিছুক্ষন তার দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রাখলেন। রাত্রে আলো আঁধারে ঘরের বিশাল পালঙ্কটাকে ঢেউহীন শান্ত সমুদ্রের মত লাগছে। সধুমায়ার ঘুমন্ত ঘুমটা ভীষন মায়াবী আর নিষ্পাপ দেখাচ্ছে। পালঙ্ক থেকে ধীরে ধীরে নবকৃষ্ণ মল্লিক নামলেন, তারপর ঘরের কোনে রাখা রূপার কারুকাজ খচিত কলস থেকে জল ঢাললেন তার নিজ গ্লাসে; এক নিঃশ্বাসে পান করে পাথরের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। নিঃস্তব্ধ রাতে সামান্য শব্দও বেশী কানে লাগল তার। নিজেই সামান্য চমকে উঠলেন তিনি; আবার তাকালেন ঘুমন্ত স্ত্রী সুধামায়ার নিষ্পাপ মুখের দিকে। যদিও শীতের আমেজ পড়তে শুরু হয়েছে তার মধ্যেই মল্লিক বংশের প্রায় মধ্যবয়স্ক এই জমিদার সামান্য গরম অনুভব করলেন। একটু চাপা কাশি দিতেই, ঘরের বাইরে কর্তব্যরত গণেশ কৈবর্ত টানা পাখার গতি আরো বাড়িয়ে দিল। তারপরও স্বস্তি হল না, নবকৃষ্ণ মল্লিকের। তিনি ঘরের পর্দা সরিয়ে বারান্দা পার হয়ে ঘরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। পাখা টানা গনেশ যথাসম্ভব দ্রুত দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলল, "পেন্নাম হই মেজ বাবু, সামান্নি ঘুমে এইলো, এমনটি আর কক্ষনো হবেনি– এবারের মত মাফ দ্যান কর্তা– আপনি ভগবান...

কারো কথায় জমিদার বাবুর কানে ঢুকছে না এখন; তিনি অন্ধকার মেশান প্রকৃতি দেখতে লাগলেন বিষন্ন মনে।

অন্ধকার যে এত সুন্দর হয়, তা তার জানা ছিল না। অন্ধকারে প্লাবিত প্রান্তর; অগণিত জোনাক পোকারা আলোর বিচ্ছুরন ঘটাচ্ছে বিরামহীন; তারপরও চাপ চাপ অন্ধকার গাছের মাথা ও নিচে, অন্ধকার বিশাল পুকুরের জলে; মাঠের সবুজ ঘাসেও

সেপটে আছে গাঢ় অন্ধকার। নবকৃষ্ণ মল্লিকের চোখে কিছুক্ষন পর অন্ধকার সহ্য হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, অন্ধকারের মধ্যেও কোন লুকানো দিপ্তী আছে– এখন জমিদার বাবু অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছেন, তবে আবঝা। নবকৃষ্ণ বাবু বুঝতে পারেন, এইমধ্য রাতে অনেকেই তার প্রাসাদে বিনিদ্র আছে। থাকার কথাও তাই, গোটা প্রাসাদ টাকে সে ঢেঁকে রেখেছে নিরাপত্তার চাদরে। আশি জন সড়কিধারী বরকন্দাজ পাহাড়া করছে সারাটা প্রসাদ। তারা যেমন সড়কি চালনায় ওস্তাদ, তেমনি সাহসী ও প্রভূভক্ত। তাই নিরাপত্তা নিয়ে জমিদার বাবু আপাতত চিন্তিত না হলেও তার চোখে নিদ্রা নেই। নাড়ি কিছু চঞ্চল। আজ দীর্ঘদিন পর, সে নাচ ঘরে যায়নি। সারা সন্ধ্যা, পদ্দিনী বাই, সুরা আর তার অনিন্দ্য যৌবন পরসা সাজিয়ে বসেছিল। আর জমিদার মেজ বাবু কিছুটা সময় পুকুর ঘাটে, কিছুটা সময় ছাদে আর কিছুটা সময় ছবি ঘরে কাটিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষত মনে বড় ধরনের অশান্তি আসলে, নবকৃষ্ণ মল্লিক ছবি ঘরে যান। কিছুটা সময় কাটান ঐ ঘরে। তিনি সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করতে যান। ছবি ঘরে তার পূর্ব পুরুষের ছবি টাঙানো আছে। সাত পুরুষের জমিদারী এই মল্লিক বংশের। তার বাবার বাবা সত্যনারায়ন সিংহ মল্লিক ভোজপুরী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। কথিত আছে, একবার সত্যনারায়ন মল্লিক শিকারে গিয়ে 'সিংহ' শিকার করেছিলেন। তারপর থেকেই তার নামের সাথে 'সিংহ' শব্দটি উপাধি হয়ে যুক্ত হয়ে যায়। তাঁর ঘোড়াশালে শোভা পেতো বিলেতি ঘোড়া। নাচ ঘরে বাঁধা থাকত লখ্‌নোর বাইজী; যার স্নানের জন্য সুদূর বিতেল থেকে সুগন্ধি জল আসত জাহাজ বোঝায় করে। মল্লিক জমিদারীর মান মর্যাদা মেজ বাবুর বাবাও রেখে ছিল। তাঁর দপটে আশপাশের মধ্যসত্ত্ব ভোগী, মাঝারী জমিদাররা সবসময় আতংকে থাকত। তার ছিল তিন রাণী আর অসংখ্য দাসী। বাগদী আর কৈবর্ত পাড়ার কালো মোটা মাগী গুলোর প্রতি ছিল তার অসম্ভব কামনা। আকণ্ঠ মদ খেয়ে রূপার বাট লাগানো তরবারি দিয়ে, ফর ফর করে ফেড়ে দিয়েছে মোটা মোটা মেয়ে ছেলের তেল তেলে মসৃণ তলপেট। তারপর ভারী পাথর লাশের গলায় বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছে প্রমত্তা ভৈরবে। এরপর ব্যারেল ব্যারেল গোলাপ জলে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে ছোট লোকের কালচে হয়ে উঠা রক্তের চাপ। তার এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে পৌরুষ খুঁজে পেয়েছিল নাটোরের রাণী ভবানী। অতিথি হয়েছিলেন নবকৃষ্ণ মল্লিকের বাবার জমিদারীতে। সেই রক্তই বইছে নবকৃষ্ণ বাবুর শিরায় শিরায়। যদিও দাপট কমেছে কিছুটা তারপরও মল্লিক জমিদার মল্লিক জমিদারই। এখনো পাঁচ ছয়টি পরগনা তার

দখলে। বছরে তিন হাজার পঁচাত্তর টাকা বাইশ পয়সা খাজনা দিতে হয়। বছরে ধান ওঠার পর বিভিন্ন এলাকা থেকে ঘোড়া শোওয়ার এনে অনুষ্ঠিত হয় ঘোড়া দৌড়। মহরমে হয় লাঠি লেখা মহা ধুমধুম করে। বৈশাখ সংক্রান্তির দিনে এখনো কয়েক হাজার লোক পাত পড়ে এই বাড়ির উঠানে। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনগর থেকে আসে দূর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগর আর আলোক সজ্জা আসে চন্দননগর থেকে। পাঁচদিন পাঁচ গ্রামে হাড়ি জ্বলে না। এখনো কাছারী ঘরের সামনে দিয়ে প্রজারা ছাতি মাথায় আর চটি পায়ে যেতে পারে না। খাজনা বাঁকি থাকলে কাছারী ঘরের সামনে নিমগাছের সাথে তাকে বেঁধে মোষ পেটানো করে পেটায় পোশাক পড়া পাইক। তারপরেও, নবকৃষ্ণ বাবু বিচলিত, নিদ্রাহীন চিন্তিত এবং কিছুটা অসহায়।

নবকৃষ্ণ মল্লিকের মুখে চিন্তার বলিরেখা গুলো স্পষ্ট হয়েছে এবার দূর্গা পূজোর পর থেকে। মালাকর, আলোক সজ্জা, প্রসাদ বিতরণ, যাত্রা পালা, নিজের ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে আমোদ সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে এবার। গেলবার কেদারগঞ্জ জমিদার বিশাল প্রতিমা তৈরী করে অনেক ধুমধামের সাথে পুজো করে মল্লিকদের মুখে অদৃশ্য কালিমা লেপে দিয়েছিল। এবার তার প্রতিশোধ নিয়েছে মল্লিকরা। সবশেষে বেশ ক'টি মোষবলি দিয়ে পাঁচ গ্রামের প্রজাদের পাঁচ দিন খাইয়ে সকলের হাতে এক আনা পয়সা নগদ দিয়ে বিদায় করেছেন মল্লিক বাড়ীর রাণী মা নিজে। এসবই ছিল সুধামায়ার আবদার। নবকৃষ্ণ মল্লিক স্ত্রীর কোন চাওয়া অপূর্ণ রাখেন নি, শুধুমাত্র দু'টি আবদার ছাড়া; একটি সন্তান, আর অন্যটি পদ্মিনী বাই -এর কোটা ত্যাগ করা। গ্রামেগঞ্জে তক্ষক না ডাকলে যেমন সন্ধ্যা মানায় না, ঠিক তেমনি সন্ধ্যা লগ্নে সুগন্ধি মেখে হাতে বেলি ফুল জড়িয়ে জুড়ি গাড়ি চড়ে বাড়ি থেকে অনতিদূর বন্দর ঘাটে বাঁধা মেয়েছেলের ডেরায় না গেলে মল্লিক জমিদার মানায় না। জুড়ি গাড়ির সামনে পিছনে থাকে চারজন সড়কি ধারী বরকন্দাজ। তখন জমিদার নবকৃষ্ণের চোখ দু'টো থাকে আদ-কোটা গন্ধরাজ ফুলের মত সিন্ধু; মুখমন্ডলে এসে পড়ে বিদায়ী সূর্যের কোমল আভা। অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে প্রায় নিরাভরন দেহে সুধামায়া এসে মেজ বাবুকে জড়িয়ে ধরে বলে,

চেয়ে দেখুন একবার, শুধু একবার; বলুন কোথায় আমার কমতি?

তোমাকে আজ চাঁদের মত সুন্দর দেখাছে রাণী– বলে তার কপালে চুম্বন করে মেজ মল্লিক। তার শরীরের সাথে আরো লেপটে সুধামায়া বলে, 'আজ পূর্ণিমা, আমার মাথা খান, আজ আর ঐ নর্দমায় যাওয়ার দরকার নেই'....

কিন্তু শেষ মেষ কাজ হয় না তার আবদারে। সামান্য সময় পর, মেজ মল্লিক জুড়ি গাড়িতে চেপে বসলেন। পিছনের দিকে আর একবারও তাকান না ফিরে।

কিন্তু দূর্গা পূজার পর থেকে নবকৃষ্ণ বাবুর মুখে আষাঢ়ের মেঘ। চিন্তা আর অনিদ্রায় চোখে-মুখে ঘোর অমানিষার ছাঁয়া। কাঁধে কোমল হাতের ছোঁয়াতে সম্বিত... ফিরে পায় জমিদার বাবু। মায়াবী কণ্ঠে সুধামায়া জিজ্ঞাসা করে,

'আপনি কি কোন কারনে চিন্তিত? পরগনায় কোন অঘটন ঘটেছে কি?' –স্ত্রীর অপূর্ব সুন্দর মুখটার দিকে কিছু সময় স্থির তাকিয়ে থাকেন মেজ মল্লিক। চাঁদের আলোয় মায়াবী মুখটা আরো মায়াময় হয়ে উঠেছে। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিক। ছোট্ট একটু কাশির শব্দ কানে আসে তার। তাকিয়ে দেখে, সামান্য দূরে একটা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তার খাত ভৃত্য বলরাম। ছোট খাটো মেদহীন শক্ত সমর্থ শরীরের বলরাম। তার দিকে উৎসুখ দৃষ্টি দিতেই বলরাম বিনীত ভাবে বলে উঠে,

– হুজুর ইসুবগুলের আর মিছরী দিয়ে একটু শরবত এনে ছিলাম– শরীর ঠান্ডা হলে নিদ্রা আসবে হুজুর।

উদাস কণ্ঠে জমিদার বাবু বলেন,

– তুই ঘুমাসনি বলরাম?

– আজ্ঞে, আমি ঘুমালে চলে হুজুর?

কথা সত্যি। বলরাম ছাড়া মল্লিক বাড়ি অচল। চারদিকে চরকির মত ঘুড়ছে বলাম। তদাকরি করছে সে। হুকুম তামিল করে চলছে বিনয়ের সাথে। আবার, বিকেলে আখড়ায় নিয়মিত লাঠি খেলায় মহড়াতে যোগ দেয় সে। মা-বাপের ঠিক ঠিকানা নেই বলরামের। এই মল্লিক বাড়িতেই মানুষ। এই বাড়ির প্রতিটি ইট-কাঠের সাথে আছে তার গভীর প্রেম। হুজুরের প্রতি আছে গভীর ভালবাসা আর ভক্তি। বলরাম হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ। তবুও তার শরীরে তাগড়া মেষের শক্তি। মেদহীন পেশী বহুল শরীর। লাঠিতে তার জুড়ি নেই এ তল্লাটে; আর তীর চালনায় ভূবন সেরা সে। আর কথা না বাড়িয়ে বলরামের হাত থেকে শরবতের পাত্রটা হাতে নিয়ে নেন মেজ মল্লিক। তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস নিজের মধ্যে চেপে একদমে শরবতটা শেষ করে খালি পাত্রটা বিশ্বাসী ভৃত্যের হাতে ফিরিয়ে দেন। জমাট অন্ধকার দেখতে দেখতে তার ভিতর থেকে তৃপ্তি প্রকাশক শব্দ বেরিয়ে আসে। সুধামায়া এবার তার হাত ধরে আরো আবেগ মাখা গলায় বলে,

– শুতে চলুন; শরীর ঠান্ডা হলে ঘুম আসবে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। চলুন; ভোর হতে

আর বাঁকি নেই–

তারপর ভোর হয় প্রতিদিনের মত। অন্ধকারের বুক চিড়ে সূর্যের আলো এই জনপদে পড়ার আগে মল্লিক প্রাসাদের বিশাল গম্বুজকে রাঙ্গিয়ে দেয়। আস্তে ধীরে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রাচীন জনপদ মেহেরপুর সহ সমস্ত পৃথিবীতে। কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে শ্রমজীবি মানুষ। ব্যস্তায় নাড়া দেয় মল্লিক বাড়ির আনাচে কানাচে। জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিক ব্যস্ত হয়ে উঠেন তার প্রতিদিনের কর্মকান্ডে; শুধু তার চিন্তার বলিরেখা গুলো অস্পষ্ট হয়ে আড়ালে চলে যায়, যেন চাঁদের গায়ে লুকিয়ে থাকা কালো কলঙ্ক। তিনি নানা কাজের মধ্যেও থাকলেন চিন্তাকিষ্ট। তবে, কাউকেই কিছুই বললেন না।

বিষয়ের গুরুত্ব আর কেউ না জানলেও বলরাম জানে আদ্য-পান্ত। যে সময় সেই নরকের সমণ এসে পৌঁছাল জমিদার মেজ মল্লিকের কাছে তখন বলরাম-ই কেবল তার কাছে উপস্থিত ছিল। সেই চিঠির নিচে মূর্তিমান আতঙ্গের স্বাক্ষর ‘দস্যু বিশে গোয়ালা’।

বিশে গোয়ালা– এ তল্লাট সহ বড় একটা এলাকা জুড়ে মূর্তিমান আতঙ্কের এক নাম। বিশে গোয়ালা ডাকাত! বর্গী দস্যুদের চেয়েও নৃশংস। সাথে আছে দূঃসাহসী একদল। সে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করে; রাত একপ্রহর পর পালকীতে চড়ে আসে সে; বেহারা তার দলের লোক। নির্জন রাতে পূর্ণিমা শেয়াল কেও স্তব্ধ করে দেয়। বিশে গোয়ালার নাম বললে শিশু কান্না বন্ধ করে; দুষ্ট গরুর গলায় এই ডাকাতের নাম লিখে ঝুলিয়ে দিলে সে শান্ত ভদ্র হয়ে লাঙ্গল কাঁধে তুলে নেন। সেই বিশে গোয়ালা চিঠি দিয়েছে মল্লিক জমিদারকে সামনের পূর্ণিমায় এক লাখ টাকা তার চায়; তা না হলে সে বাড়ি আক্রমন করবে।... মেজ মল্লিকের ঠাকুর দা... নিজেই ডাকাত পুষতেন। মেজ মল্লিকের বাবাও ছিলেন ভীষন রাগী আর খুন খারাপি করা মানুষ। কিন্তু, এখন দিন বদলেছে, জোড় কমেছে রক্তের আর টাকার। মানুষ এখন পূর্বের চেয়ে অনেক সংবদ্ধ আর স্বাধীন চেতা। তাই ইচ্ছা থাকলেও বিশে ডাকাতের সাথে লড়াইয়ে অবতির্ন হতে পারছে না নবকৃষ্ণ মল্লিক। অন্য দিকে সাত পুরুষের জমিদারীর মর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষা– তাছাড়া দূর্গা পূজোর পর সরকারি খাজনা পরিশোধ করে মল্লিক কোষাগার এখন শূন্য। সব মিলিয়ে মেজ মল্লিকের চিন্তার অন্ত নেই। সংগত কারনে তার ঘুম হয় না; চোখের নিচে কালি; চিন্তার বলি রেখা গুলো কখনো কখনো দিনের ব্যস্ততার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। দিনের কাজের মাঝে অকারনেই কাউকে না কাউকে গালি দিয়ে ফেলছেন তিনি। যেমন এখনই পুরোন নায়েব কে ধমকে উঠেলেন সকলের সামনেই,

রাখেন তো আপনার ধানাই-পানাই। আমাকে বোকা পেয়েছেন? আমি বুঝি না কিছু....
আজ্ঞে হুজর;
থামেন! মানব প্রেম! প্রজা প্রীতি! এদিকে আমার কোষাগার শূন্য। ছুঁচো তে কেত্যণ করছে...
হুজুর, ফসল না হলে, খাজনা মাফ করতে আপনি আদেশ দিয়েছেন।
দিয়েছিলাম এখন তুলে নিলাম। খাজনা বাঁকি থাকলে পাইক নিয়ে যাবেন। চাবকে পিঠে চামড়া তুলে নেবেন। তারপর এইসব ছোট লোকের বাচ্চাদের চামড়া দিয়ে আমার ঘোড়ার জুড়ো বানিয়ে দেবেন। খোঁয়া ওঠা রাস্তায় চলতে ওদের বেশ কষ্ট হয়।
মল্লিক বাবু কাচারী ঘর ত্যাগ করার পূর্বে আরো বললেন,
শুনুন নায়েব, আগামী সাত দিনের মধ্যে এক লক্ষ টাকা আমার চাই; কোথায় পাবেন জানি না...

হুজুর চলে যাওয়ার সাথে সাথে নায়েব হরিপ্রকাশ সিন্দুক খুলে লাল মলাটের খাতা নিয়ে বসলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা যোগ বিয়োগ কষে চললেন তিনি।

নায়েব হরিপ্রকাশ দত্ত এক সময় যখন নিশ্চিত হলেন যে, এক সপ্তাহ তো দূরের কথা আগামী একমাসেও কোষাগার থেকে এক লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া সম্ভব না– তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। নায়েব মশাই পুরনো লোক মল্লিক জমিদারের তেজ তার জানা। সময় মত টাকা হাতে না পেলে নবকৃষ্ণ মল্লিক সড়কি খাওয়া বুনো শুয়োরের মত অন্ধ হয়ে পড়বেন– তা তার জানা। কিন্তু এক সাথে এত টাকা হঠাৎ কেন প্রয়োজন হল?– মনে মনে ভাবতে লাগলেন মল্লিক বাড়ির পুরনো নায়েব হরিপ্রকাশ দত্ত। এই বাড়ির পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন যেমন উদার তেমনি চরিত্রহীন লম্পট আর মদ্যপ; একর একর জমির ফসল আর কাঁচা টাকা জলের মত ঢেলেছে বাজারে মাগীদের পায়ে ফলে, সেই দোর্দন্ড জমিদারী আজ তলনিতে ঠেকতে বসছে। নায়েব বিড়বিড় করে উঠেন, এদের সময় শেষ হয়ে আসছে; ধ্বংস হবে এই অত্যাচারীর জাত; যা করার দ্রুত করতে হবে– সময় হাতে বড় কম! এর মধ্যে ধুম করে বলরাম ঘরে ঢুকে বলে,
– কর্তা মশাই, আপনারে একবার রাণী মা স্মরণ করিচে ...

চমক দিয়ে নায়েব বাস্তবে ফিরে আসে। রাণী মা অর্থাৎ মল্লিক গিন্নী! কি জিজ্ঞাসা করবেন, কিছুটা আঁচ করতে পারছেন এই অভিজ্ঞ নায়েব। কি উত্তর দেবেন তিনি, মনে মনে ভাবতে ভাবতে টলমল পায়ে অন্দর মহলের দিকে এগুতে থাকলেন তিনি... .....

......

নবকৃষ্ণ মল্লিক আজ একটু সকাল সকাল পান পাত্র নিয়ে বসেছেন। ক্রমেই তার পানের পরিমাণ সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন তার হাত কাঁপছে; চোখ লাল রক্ত জবা; শরীর দুলচ্ছে। তার জিহবা আড়ষ্ঠ হয়ে আসছে দ্রুত। তবু তিনি ফরাসী কাঁচের গ্লাসে সোনালি তরলে নিজেই সোডা ওয়াটার ঢেলে নিচ্ছেন। জমিদার বাবুর এই সকাল সকাল মদ্য পানের খবর ইতিমধ্যেই অন্দরমহলে পৌছে গেছে। রাণী মা স্বয়ং নেমে এসেছেন দোতালা থেকে। দাঁড়িয়েছেন পর্দার আড়ালে। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বলরাম, এই মুখ পোড়া গাধা, তোর হুজুর কে বল, অনেক হয়েছে; এখন খ্যান্ত দিক" ...

নবকৃষ্ণ মল্লিক তার রক্ত জবার মতো চোখ দু'টো তুলে জলধ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,

– কে, কে ওখানে?

– আপনি আর খাবেন না। আমার দিব্বি! আপনি উঠুন। শরীর খারাপ করবে যে ...

– মেয়েছেলের কথায় মল্লিক-রা কখনো চলেনি। আমিও চলব না সুধামায়া। তুমি এখান থেকে চলে যাও; আর কখনো

এখানে এ অবস্থায় আসবে না, খবরদার!

কৃষ্ণনগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের আদরের কন্যা, প্রভাবশালী মল্লিক জমিদারের স্ত্রী সুধামায়া এই অপমান সহ্য করতে না পেরে, শাড়ীর আঁচলে কান্না ঢেঁকে খাস দাসী-বাঁদিদের সামনেই দোতালার সিঁড়ির দিকে ছুটে চলে গেলেন।

ক্রমেই এই জনপদে ঘন রাত নামতে থাকে ঘটা করে। চারদিকের জমাট বাঁধা অন্ধকারে ঝিঝি পোকার উল্লাস বাড়তে থাকে। মল্লিক বাড়ির ঝাড়বাতি গুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দাস-দাসীরা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়েছে ক্রমেই। বাড়ির বিশাল নির্জন দেউড়ির কোনখানে বাস্তু এক তক্ষক শেষ বারের মত ডেকে ওঠে। অভিমানী জমিদার গিন্নীর চোখের জলে তার বালিশ সিক্ত হয়– আর অন্য দিকে আরো বেসামাল হয়ে উঠে জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিক। চিৎকার করে উঠেন তিনি। অসংলগ্ন গলায় বলেন ওঠেন, "কে আছিস আমার তরবারি নিয়ে আয়; আমি এখন জীবিত ... আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মল্লিক বংশের রক্ত ... .

নবকৃষ্ণ বাবুর এই চিৎকার জমিদার বাড়ির নিঃসঙ্গ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে এক প্রতিধ্বনি তোলে। দাসদাসীদের অনেকেই ভিতরে ভিতরে মজা পায়, কেউ অভিশাপ দিয়ে উঠে– আবার কেউ কেউ আতংকিত হয়। মাতাল মেজ মল্লিক লাথি দিয়ে শেত পথরের টেবিলে

সাজানো বিলেতী কাঁচের গ্লাস গুলো ফেলে দেয় ঘরের মেঝেতে। নিমেষেই সেগুলো ভেঙ্গে কুচি কুচি হয়ে যায়। ঝাড়বাতির আলো সেই কুচি কাঁচের উপরে পড়ে নানা প্রতিবম্ব তৈরি করে। মেজ মল্লিক অসংলগ্ন গলায় হেসে উঠেন, হাঃ হাঃ হাঃ। তার এই অপ্রকৃতস্থ অট্টহাসির সাথে ধাতব শব্দ মিলে রাতের জমিদার বাড়িতে এক ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করে। এর মাঝেই তিনি উঠলেন; তারপর নিয়ন্ত্রণহীন শরীরটা নিয়ে সামনে এগুনোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, সামনে দরজায় কাউকে দেখে তিনি থমকে যান। দরজায় দাঁড়ানো মূর্তিটিকে চেনার চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। মনে মনে হয়তো মেজ মল্লিক কিছুটা ভয়ও পেয়েছেন। 'কে ওখানে?' জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করে নবকৃষ্ণ মল্লিক– কিন্তু তার গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। ঘরে অসহ্য রকমের নিরবতা। ছায়া মূর্তিই প্রথমে নিরবতা ভঙ্গ করলো, "হুজুর, আমি বলরাম।"

বলরামের গলায় এমন কিছু ছিল যাতে বেসামাল জমিদার চমকে উঠলেন। তার মনে হল, বলরামের চোখ আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝড়ছে; নীল আগুন! বলরাম ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। তার সুঠাম বুক একটু দ্রুত উঠানামা করছে। বলরাম আবার বলে উঠে, "হুজুর, আপনার কোন চিন্তা নেই, আমি বলরাম যতক্ষন আছি"।

অতি আশ্চর্যজনক ভাবে নবকৃষ্ণ বাবু যেন স্বাভাবিক হতে শুরু করলেন। বলরামের চোখের নীল রশ্মি দ্রুত তার অসংলগ্নতা কাটাতে সাহায্য করছে। তাছাড়া এই দুশ্চিন্তার ফুটন্ত সাগরে প্রভাবশালী জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিক সামান্য ভৃত্যের এই আশ্বাস থেকেও যেন সাহস সঞ্চয় করতে লাগলেন। তার ক্ষতবিক্ষত মানসপটে থেকে হঠাৎ-ই এক দুঁফোটা আশা চুঁইয়ে পড়তে লাগল। বলরামের বলিষ্ট বুকের চাঁই দু'টো এখনো হাপরের মত উঠানামা করছে; শরীর থেকে ঘাম চুইয়ে পড়ছে দামি বেলে পাথরের পরিস্কার মেঝেতে। কিন্তু এখন জমিদার বাবু এ সব দেখছেন না এখন; তার কাছে মনে হচ্ছে, তার সাত পুরুষের এই জমিদারী, এই বিত্ত বৈভব, ঐ সর্বগ্রাসী দস্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য এই বুকটা এগিয়ে আসছে; এই বুকই আগলে রাখবে তাকে এবং তাদের জমিদারীর ঐতিহ্যকে। বলরাম এবার, সাপে ধরা ব্যাঙের মত কিছুটা অস্পষ্ট আর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠে, "এই বললাম, বেঁচে থাকতে, মল্লিক বাড়ীর কোন ক্ষতি কেউ করতি পারবিনি।"

সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত ধীর স্থির গলায় নবকৃষ্ণ বাবু বলেন,

– তুই, কী বলতে চাইছিস, বলরাম?

– আগামীকাল পূর্ণিমে, বিশে গোয়ালার আসার তারিখ; কিন্তুক আমাকে মোকাবিলা করে তাকে এখানে আসতি হবে, হুজুর।

– তার মানে?

– বিশের সাথে আমার দেখা হবে, ভিটির মাঠে ফাঁকায়। রাত দুই প্রহরে। মল্লিক বাড়ি ছেড়ে অনেক তফাতে (দূরে)।

– সাথে ক'জন পাইক লাগবে, বলরাম? নবকৃষ্ণ বাবুর গলায় হতাশা মেশান কোমলতা ঝড়ে পড়ল। নেহাতই পরাজয় জেনেও– এ যেন সামান্য প্রতিরোধ। জলের তোড়ের মুখে সামান্য এক মুটো খড়– তারমাঝেই একটা সান্তনা খুঁজে পেতে চায় জমিদার মেজ মল্লিক। এই প্রথম জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিক বলরাম কে "তুমি" সম্মোধন করলেন।

– বলরাম আগের চেয়ে আরো দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠে, "একাই যাব আমি"। আরো একবার তার দু'চোখের মনি জ্বলে উঠে। সেই নীল রশ্মি যুদ্ধের মাঠের কোন ঘোড় শওয়ারের ছুড়ে দেওয়া বর্শার মত নবকৃষ্ণ মল্লিক কে গেঁথে ফেলে। দরজায় দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকা বলরাম কে এখন বুনো শুরোরের মত দেখাচ্ছে, যার মাদীটাকে কেড়ে নিয়ে গেছে অন্য শুরোরের পালে।

পরদিন বাড়ির কুলপন্ডিত সাত সকালে ঘোষণা করলেন, "পূর্ণিমা লাগবে দুপুরের আগ থেকেই।" কোন কারণ ছাড়াই নায়েব সহ দাস-দাসী, পাইক কারো মুখেই কথা আর হাসি দেখা গেল না। রাণী মা, নিজ ঘরে স্বেচ্ছা বন্দী হয়ে থাকলেন। জমিদার বাবু সারা দিন উপোষ থেকে দূপুর হতেই পূজো ঘরে ঢুকলেন। এই বিশাল বাড়ির অন্যদের কমবেশী দেখা মিললেও, টিকেটি পাওয়া গেল না, বলরামের।

বলরাম অনেক আগেই, এসে পৌঁছেছে জমিদার বাড়ির গোপন অস্ত্রাগারে। ঘরটি গোপন। কেউ জানে না এই ঘরের অবস্থান; আর যারা জানে তারাও ভূলে থাকতে চায়। বেঢপ আকৃতির লোহার জং ধরা তালাটা খুলে, ভারি কাঠের পাল্লা সরিয়ে বলরাম অস্ত্রাগারে যখন ঢুকল তখন বেশ দুপুর। অথচ ঘরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। মস্ত ঘরটা জুড়ে শুধু নারকেল তেল মেশান লোহার গন্ধ। নানা সময়ের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র আছে এই ঘরে। বর্শা, তরবারি, চাবুক, গুপ্তী, ঢাঙ্গী, বর্ম, তীর ও ধনুক, বাঘ-থাবা, রামদা, লাঠি আরো কত। দাঙ্গা ফেসাদ আগের চেয়ে অনেক কম, তাই এসব লোহার ঔজ্জল্য কিছুটা ফিকে হয়েছে। সামান্য বালি পড়লেই জাত সাপের ড্যাপের মত ফনা দুলিয়ে হিসহিস করে। বলরাম তার পছন্দের অস্ত্র তীর গুলো নিয়ে পা ছড়িয়ে বালি দিতে বসল। তাল

কাঠের উপর বালির সাথে ঘষা খেয়ে ইস্পাতের ফলা তীর গুলো এই নির্জন ঘরে এমন শব্দ তুলল যে, সে শব্দে যে কোন পুরষের রক্তে বান ডাকতে বাধ্য– আর অন্য দিকে আশংকার পরশ বুলিয়ে দেবে সধবার অন্তরে। বলরাম দীর্ঘ সময় ধরে একমনে কাজটি করে চলল। ঘামে তার সারা শরীর ভিজে উঠল ক্রমেই। তার পিঠের মাংস পেশী গুলো শক্ত হয়ে উঠল; আর তার চোখ দু'টো ক্রমেই রক্ত বর্ণ হয়ে উঠল।

মেহেরপুরে এখন নিঝুম রাত। চারদিকে শুধু ঝিঁঝি ডাকার শব্দ। কান আরো তীক্ষ্ণ করলে হয়তো শোনা যাবে মধ্যবিত্ত নিম্নবর্ণিত আর হতদরিদ্র হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের সুখ নিদ্রার নাসাধ্বসি। রাত এখন প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। নিদ্রাহীন বলরাম তার রণপায়ে বাতাসের আগে দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই নিশুতি রাতে কারো চোখে পড়ার ঝুঁকি নেই। মাথার উপর খোলা আকাশ। জোসনা প্লাবিত অবারিত প্রান্তর; আর সমতল ভূমি। বলরামের চলতে অসুবিধা হচ্ছে না মোটেও। গাছের ডালে রাতজাগা পাখিরা অবাক বিস্ময় দেখতে থাকে একটা বিশাল লম্বা দু'পেয়ে ভুত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে নিশুতি ভেদ করে।

শেষ পরিচ্ছেদ

মল্লিক বাড়ি থেকে অনেক দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা প্রাচীন অশত্থ গাছের উপর বলরাম অপেক্ষা করতে থাকে বিশে ডাকাতের জন্য। হাতে তার প্রিয় লাঠি, কাঁধে তীর ধনুক আর কোমরের খুরপিতে একটা ছোরা গোঁজা আছে। বিশেষ প্রয়োজনের জন্য। ফাঁকা মাঠে নির্জনতার সাথে নিঃস্তব্ধতা গলাগলি করে এক অসহনীয় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। অনতিদূরের সীমান্ত রেখার উপর চাপ চাপ অন্ধকার থমকে আছে। সেই অন্ধকারে উপর চাঁদের চকচকে আলো পড়ে রসহ্যময় করে তুলেছে চারপাশ। বলরামের কাছে মনে হয়, ঐ সীমানায় ওপড়ে আর কিছু নেই; মনে হয়, যা দেখছি তাই সত্য, দৃষ্টির বাইরে আর কিছু নেই। হঠাৎই সে লক্ষ্য করল, চারদিক যেন খুব বেশী নিরব হয়ে পড়েছে। কিন্তু সামান্য পরেই, বাতাসে অতি দূর থেকে ভেসে আসছে একটা থমথমে শব্দ; শব্দটা কিছুটা চেনা আবার কিছুটা অচেনা। বলরাম তার ইন্দ্রীয় সজাগ করে। গাছের ডালে বসেই সে দেখতে পায়, বন সীমান্তের ওপাড় কমলা আভায় ছেয়ে যাচ্ছে দ্রুত। যেন কোন সূর্যদয় হচ্ছে নতুন কোন অচেনা জগতে। সাথে রক্তহিম করা হুম্ হুম্ শব্দ। বলরাম বুঝতে পারে, বিশে গোয়ালার পালকী আসছে তাদের মশালের আলোতে চারদিক

রাঙা হয়ে উঠেছে।

বলরাম স্থির চিত্তে মনে মনে তার ইষ্ট দেবের নাম স্মরণ করে, তারপর সিংহের হুমকার দিয়ে যমদূরের মত তাদের পথের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। পালকী থেমে যায়। বিশে ডাকত হতচোকিত হয়ে পড়ে। সে বিশ্বাসই করতে পারে না, কোন মানুষ তার যাত্রা পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু, বলরাম তখন সাধারণ মানুষ না। তার চোখ আগুনোর গোলা, শরীর শঙ্খচূড় সাপের মত টানটান আর অদম্য সাহস আর প্রত্যয়ে টানটান স্নায়ু। মূহুর্তে ডাকাত দলের অন্যরা বলরামকে ঘিরে ফেলে। তারা শুধু হুকুমের অপেক্ষা করতে থাকে। আস্তে ধীরে বিশে ডাকাত পালকী থেকে বেরিয়ে আসে। বলরাম একদিক খোলা রেখে তার প্রিয় অস্ত্র লাঠি গাছাটা ধরে অবস্থান নিয়েছে।

আহত নেকড়ে যেমন মরণ কাঁমড় দেওয়ার আগে হিংস্র হয়ে ওঠে বলরামকে এখন তার চেয়েও হিংস্র মনে হচ্ছে। ওর ঠোঁট দু'টো ফাঁক চোখ দু'টো আগের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণ আর পা দু'টো একটা বিশেষ ছন্দে সামান্য দুলছে। বিশে ডাকাত খুব বিরক্ত হলেও সাহসী আর গুনী লোকের কদর করতে জানে। এই উটকো ঝামেলা টাকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে দু'টো কারণে। বিশে ডাকাতের ধারণা ছিল, সে অপ্রতিরোদ্ধ; কিন্তু এখন তার একটা লোক পাওয়া গেল যে তার সামনে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া লোকটি লাঠি ধরতে জানে। দলের অন্য সদস্যরাও প্রস্তুত! বিশে ডাকাত এই নিঃস্তব্ধ চারদিক প্রকম্পিত করে চিৎকার করে ওঠে,

– মার শালা কে! ওর মাথা-টা কেটে নে এক্ষুনি ... ...

মূহুর্তে তিনজন লাঠিয়াল একযোগে বলরামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলরামের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল নিমেষেই। লড়াই রত বেজীর মত লাফ দিয়ে দিক পরিবর্তন করে সে; তারপর তার হাতের লাঠি কামাড়ে লাটিমের মত গুঁ গুঁ করে ডেকে ওঠে; সাথে বাতাস কাটার শন শন শব্দ। বললাম চরকির মত ঘুড়ছে; শঙ্খ চূড় সাপের মত টানটান হয়ে যাচ্ছে তার দু'পায়ের ওপর; আবার কখনো হনুমানের মত গুড়ি মারছে মাটিতে– আর সে ফাঁকে তার মাথার ওপর দিতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিপক্ষের লাঠি সামান্য সময়ের মধ্যে বিশে ডাকাতের তিন সদস্য নিঃশব্দে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ... ... বলরাম পূর্বের চেয়ে আরো হিংস্র হয়ে তার প্রিয় লাঠিগাছা ওর দিয়ে নতুন আক্রমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ...

মূহুর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় বিশে গোয়ালা নিজে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

তার দলের মধ্য থেকে আরো ক'য়েকজন এগিয়ে আসার আগ্রহ প্রকাশ করলেও সে নিজেই তাদের লড়াই থেকে বিকৃত করল। একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে বিশে ডাকাত বুঝে গেছে যে, বলরামের তুলে সকল কে শান্ত হওয়ার আদেশ দিল। তারপর, বলরাম কে উদ্দেশ্য করে ধীরে ধীরে বলে উঠল,

– তুই কে? কি চাস?

– তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমার নাম বললাম;

চারদিক যেন আরো নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এই নৈশব্দ কে ভয়াবহ করে তুলছে ডাকাত দলের আহত সদস্যদের গোঁঙ্গানি। মশালের কমলা শিখা গুলো আকাশ ছুঁতে চাইছে; সেই আলো ডাকাত সদস্যদের নিদ্রাহীন চেহারার উপর কমলা রংয়ের আভা ফেলেছে। তাদের চোখে মুখে ভয়ের কালো ছায়া। বলরামের কথার উত্তরে, বিশে গোয়ালা, বলে,

– যাব মল্লিক বাড়ি। চাঁদার টাকা আদায় করতে; না দিলে সকলকে কেটে ফেলব; মাগী গুলোকে বানাব দাসী … …

– আমি ঐ বাড়িতে থাকি; তাদের নুন খেয়েছি।

– তাহলে?

– তুমি ঐ বাড়িতে যেতে পারবে না; আর গেলে যেতে হবে আমার লাশ পেরিয়ে …

বিষয়টির গুরুত্ব দ্রুত বুঝতে চেষ্টা করে বিশে গোয়ালা। একটা বিষয় পরিস্কার, বলরাম পথ ছাড়বে না। আর এ মূহুর্তে তার সাথে লড়াই করার কোন মানে হয় না; তাছাড়া রাত শেষ হতে বেশী বাঁকি নেই। তাই সবমিলিয়ে গলার স্বর কিছুটা নামিয়ে বিশে ডাকত বলে উঠে,

– লড়াই এ কাজ নেই বললাম। লাঠি নামাও। স্থির হও।

– তুমাকে বিশ্বাস কি?

– বিশে ডাকাত বিশ্বাস ভাঙ্গে না– সে এক কথার মানুষ। এখন বল, তুমি আসলে চাও কি?

লাঠি নামিয়ে বলরাম সকলের দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে, ধীরে ধীরে বলে,

– তুমি আমার মনীবের বাড়ি যাবে না, কোন ক্ষতি করবে না, তাছাড়া তুমি আমার এ অঞ্চলে আর আসবে না– এই কথা দাও।

সামান্য সময় চুপ থাকে বিশে ডাকাত। চাঁদের আলোতে ধবধবে চারধার; খোলা আকাশে তুলো মেঘেরা চাঁদের আলো গায়ে মেখে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ছে। কোন এক

রাত জাগা পাখি হঠাৎ কোন গাছের ডালে ডানা ঝাপটে ওঠে। বিশে ডাকাত বলে, "বলরাম, তুমার মত অনুচর নয়, তোমার মত ভাই চাই আমি ..." আমি তুমার লড়াই ক্ষমতা আর প্রভু প্রীতি দেখে খুশী হয়েছি। কিন্তু, আমারো তো একটা নীতি আছে; আমাদের এই পথে ক্ষমা করার কোন সুযোগ নেই– বরং ....

– বল, বরং কি?

– বরং হয় হারাতে হবে নয় হবে মরতে। তাই আমি তুমার আরো একটা পরীক্ষা নিতে চাই; যদি তুমি জয়ী হও, তাহলে তোমার কথা মেনে নেবে– আর যদি তুমি হেরে যাও তাহলে ... কথা শেষ না হতেই বলরাম বলে উঠে,

– তাহলে বলরাম তার মরণ তোমার কাছে ভিক্ষে চাইবে।

বল, কি পরীক্ষা তুমি চাও? কিসের পরীক্ষা?

– তোমার তীর ধনুকের পরীক্ষা।

এই কথার সাথে সাথে বলরামের বুক থেকে একটা পাথর সরে গেল। কারণ তীর ধনুকের উপর তার আছে আঘাত বিশ্বাস। তীর ধনুক তাকে এখনো কখনো নিরাশ করেনি। সে বলে,

– বল কিভাবে পরীক্ষা দিতে হবে?

কিছুটা সময় নিয়ে বিশে ভাবতে থাকে। আর তার মধ্যে একখন্ড কালো মেঘ চাঁদের গায়ে গিয়ে পরে; অন্ধকার হয় চারপাশ; আবার মেঘ সরে যায়, চাঁদের আলো ঠিকরে পরে। মশালের আলো আরো কিছুটা মৃয়মান হয়ে আসে। বিশে ডাকাতের সগেরেদের চোখে মুখে ক্লান্তি আরো স্পষ্ট হয়। আর এর মাঝে বলরাম দৃঢ় প্রত্যয়ে অপেক্ষা করে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। বিশেষ ডাকাত বলে উঠে;

– বলরাম, আমি কতগুলো পাখি উড়িয়ে দোব। আর তুমি সেই উড়ন্ত পাখি শিকার করবে এই আধো জোসনায় ... ... বাজি?

দস্যুদের চোখে হালকা খুশির ঝিলিক দ্যাখা দেয়। তারা তাদের সঙ্গীকে আহত করার প্রতিশোধ নেওয়ার আশায় চনমনে হয়ে ওঠে।

বললাম নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাতের আকাশে চকচকে মেঘ নিঃশব্দে উড়ে যায় দূর অজানায়। নিঃস্তব্ধতা জমাট বাঁধতে থাকে। শেষ রাতের এই হিমশীলতার মাঝেও বললামের জুলপি ভিজে ওঠে। সে লক্ষ্য করে, সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার এই নিরবতা দেখে তারা সামান্য কৌতুকও বোধ করছে; বলরাম তার সমস্ত চিন্তা

শক্তি কে একীভূত করে; তারপর সে বলে ওঠে,

– রাজি।

– বিশে ডাকত বলে, পাখি আকাশে উড়লে, তবে তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ করবে; বল রাজি?

– রাজি।

– এই কে আছিস পাখি উড়া ...

– ডাকাত সর্দারের হুকুমে অন্যরা একটা গাবগাছের নিচে জড় হয়; তারপর সকলে একসাথে চিৎকার করে ওঠে;

– হা-হু-হু-যা-

মূহুর্তে এক ঝাঁক পাখি গাব গাছের ডাল ছেড়ে আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পত পত করে রাতের আকাশে পাখা মেলল। বলরাম ক্ষিপ্র হয়ে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। সে দেখল এক ঝাঁক পাখি রাতের আকাশে বেঘর হয়ে, উড়ে যাচ্ছে; তাদের চোখে মুখে আতঙ্ক আর নিজের ঘর ছাড়ার কষ্ট। বলরামের মায়া হয়। গৃহহীন আতংকিত পাখিদের সাথে নিজের একটা মিল খুঁজে পায় সে। তার মনে হয়, পাখির মত সেও বে-ঘর! ওরা হয়তো কোন আশ্রয়ে ফিরতে পারবে কিন্তু বলরামের ফেরাটা নিশ্চিত নয়।

সে বুঝতে পারে, সময় চলে যাচ্ছে। সে আবার তার চিন্তাকে একাগ্র করে। তারপর, ধনুকের ছিলায় তীর লাগিয়ে উড়ন্ত পাখি গুলোকে দেখতে থাকে। ধনুক, তীর হাত ও দৃষ্টি সমান্তরাল.... সে আর কিছুই দেখছে না- উড়ন্ত পাখি ছাড়া। সে এখন আর কিছুই ভাবছে না, পাখি ছাড়া– বলরামের বাহুর মাংসপেশী দৃঢ় হয়ে উঠে। বিশে ডাকাত, বিস্ময় ভারা চোখে দেখতে থাকে এই দৃশ্য। তার মনে পরে, ছেলে বেলায়, তার ঠাকুমা, ননীবালা, তাকে মহাভারতের অর্জূনের কথা শুনিয়েছিল– আজ সে সেই অর্জুনকে দেখছে! খালি গা, খালি পা, সুঠাম শরীর আর অদম্য সাহসী মুখ মন্ডল...

মূহুর্তে বলরামের হাতের তীর শূন্যে ছুটে যায়। ‘হুশ;। আর সাথে সাথেই খানিক দূরে একপিন্ড মাংস দলা পড়ার শব্দ হয়– ধপ। বিশে ডাকাতের লোকেরা দৌড়ে গিয়ে খুঁজে আনে একটা মাথা বিহীন পাখির দেহ। যার দেহ তখনো গরম বিশে ডাকাত ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। বলরাম তখন ক্লান্ত; এই ভীষণ সাহসী লোকটা যেন একটা পাখি হত্যা করে খুবই ক্লান্ত আর বিমর্ষ হয়ে পড়ছে ... আবেগ ঝড়া গলায় বিশে ডাকাত বলে ওঠে, “বলরাম, তুমি সাধারণ মানুষ নও; তুমি অর্জুন তুল্য...

শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বলরাম উত্তর করে, “অর্জুন মহান! আমি ছোট জাত; আমি একলব্যের

সন্তান– বলরামের এই উত্তরে বাকরুদ্ধ বিশে ডাকাতের বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে যায়, সে বৃদ্ধাঙ্গুলের সাহায্য না নিয়ে তীর চালিয়েছিল। বিশে ডাকাত ছেড়ে দিয়ে দু'পা পিছিয়ে আসে তারপর অভিভাদন করে পরম শ্রদ্ধায়.......... তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হতে চলছে। দূধর্ষ বিশে গোয়ালা বললাম কে আরো একবার আলিঙ্গন করে, তার দেওয়া শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে– এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করে তার দল বল নিয়ে ফিরে চলল। বলরাম তার ক্লান্তি মেশন পরিতৃপ্তি নিয়ে তাদের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল।
রাতের আঁধার কেটে যায় দ্রুত। ভোর হয়। মেহেরপুরের জনপদে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার অনেক আগে মল্লিক বাড়ির সুউচ্চ গম্বুজ রাঙা হয়ে উঠে। সেই রাঙা আলোতে চনমনে হয়ে উঠে মল্লিক বাড়ি। হাসিমুখে ঘরে থেকে বেড়িয়ে আসে মল্লিক জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিক। আতঙ্ক কেটে গেছে। জমিদার নবকৃষ্ণ মল্লিককে শরৎকালের সকালের মতই নির্মল দেখাচ্ছে। সেই হাসি অন্যদের মুখের ছড়িয়ে পড়ল মূহুর্তে। আনন্দ হিল্লোল বইছে চারদিকে এই উৎসব মুখর মল্লিক বাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, এই পৃথিবী কত আনন্দময়; কত রহস্যময় এর রাত দিন। এই আনন্দ মুখর পরিবেশে কেউই তুচ্ছ বলরামের খোঁজ রাখলো না ... ...

সাপ লুডু

নিউ মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে মেঘোরী ভুলে গেল সে কি কিনতে এসেছে। অবশ্য ইতিমধ্যে বেশ কিছু জিনিস সে কিনে ফেলেছে; মাথার ক্লিপ, বাসন মাজার মাজুনি, চা ছেকনি, সেপটিপিন, গরম তরকারি নামানোর জন্য ছোট প্যাড– কিন্তু, আরো কিছু কেনার কথা ছিল তার, কিন্তু মনে পড়ছে না এখন। মেঘোরীর প্রায়ই এমন হয় আজীমপুর সরকারি কোলনির ছোট্ট ফ্লাটে দুপুরের দিকে ভীষন একাকি হয়ে যায় সে। ঘর কন্যার কাজ ফুরিয়ে যায় অমিত অফিসে যাওয়ার পরপরই। তখন, খবরের কাগজ, টেলিভিশনের প্যান প্যানে সিরিয়াল আর মান্না দে মেঘোরী প্রতিদিনের সঙ্গী। তার আগে অমিতের নাস্তা তৈরি, লাঞ্চ রেডি করে দেওয়া, মোজা জুতা সাজিয়ে, টাই সব হাতের কাছে দেওয়া; শেষ মেষ অমিতের নেভিব্লু ফুলস্লিপ শার্টের কলারে টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে প্রতিদিন একই কথা বলা,

– সাবধানে যাবে; আর তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু.........।

তারপর ছোট্ট ফ্লাটে অসম্ভব একা হয়ে যায় মেঘোরী। মাঝে মাঝে এই একাকিত্ব তাকে চারদিক থেকে এমনভাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলে তখন কলেজে ফেলে আসা ছটফটে সেই সব স্মৃতি গুলো ভীড় করে স্মৃতির জানালায়– আর তখন মেঘোরীর ইচ্ছে করে ছুটে পালাতে; মনে হয়, সুখী মানুষের ভিড়ের স্রোতে মিশে যেতে। জীবন টাকে বড় জীর্ণ, বড় তুচ্ছ মনে হয়– ঢাকা শহরে এরকম জায়গা একটাই, আর সেটা নিউ মার্কেট। এদিক-সেদিক বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে অমিতের পক্ষ থেকে কোন বাঁধা নেই। অমিত প্রায়ই বলে, সারা দিন রুমে বসে টিভি না গিলে, একটু এদিক ওদিক গেলেই তো পার। প্রতি সপ্তাহে মনে করে, অমিত মেঘোরীকে এদিক ওদিক অথবা নিউ মার্কেটে যাওয়ার জন্য কিছু টাকাও দেয় নিয়ম করে। সেই গোচ্ছিত টাকা থেকে কিছু টাকা নিয়ে আজ মেঘোরী নিউ মার্কেটে এসেছে। এটা-ওটা কিনেছে আর বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরতে ঘুরতে ভুলে বসে আছে আসলে কোন জিনিস সে কিনতে এসেছে। কোলাহল পূর্ণ নিউমার্কেটে মানুষের অভাব নেই। বিশেষ করে তরুন-তরুণী। জলস্রোতের মত ঢুকছে তরুণ-তরুণীরা। ঢুকছে মধ্যবয়সী পৌঢ় আবার মেঘোরীর বয়সীরাও। এত মানুষ প্রতিদিনই আসে এখানে? মেঘোরী ভাবতে থাকে, মানুষের প্রতিদিন এতকি কেনার থাকে? মানুষ কি খুব অভাবে

আছে? নাহ! অভাব মেটাতে প্রয়োজন টাকা– এ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা দোকানীর সাথে খুব বেশী দাম দর করে না এখানে। মেঘোরীর হিসাব নিকেষ সব জট পাকিয়ে যায়। সে আবার উদাস হয়ে যায়। কিছু না দেখার দৃষ্টি নিয়ে সে চারপাশটা দেখতে থাকে। একটা বাচ্চা তার মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আইসক্রীমের দোকানে; এক জোড়া তরুণী দোকানে দাঁড়িয়ে অবলিলায় ব্রা দেখছে উল্টে-পাল্টে; একদল তরুণ উচ্চ স্বরে চলমান রাজনীতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছে। আর তাদের মাথার উপর খোলা আকাশ! নীল! তুলো মেঘ উড়ে যাচ্ছে ইচ্ছা মতন। নীল আকাশে তুলো মেঘ আর বাতাসে নাম না জানা ফুলের মিশে থাকা গন্ধ মনে করিয়ে দেয় শরৎ এসেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘোরীর মনটা ভীষন উৎফুল্ল হয়ে উঠল; আর সাথে সাথে তার মনে পড়ল, সে আসলে এখানে এসেছে তার স্বামী অমিত চৌধুরীর জন্য আসন্ন মহালয়া উপলক্ষে একটা গিফ্‌ট কিনতে। আর সাত দিন পরই মহালয়া। তার সাত দিন পর দুর্গা পূজো। প্রতি পূজোতেই মেঘোরীকে যেতে হয় তার শ্বশুর বাড়ী দিনাজপুর। আর লক্ষ্মী পূজো সারতে হয় তার বাপের বাড়ি ফরিদপুর। সামান্য কটা দিন ছুটি থাকে অমিতের। দৌড় ঝাঁপের মধ্যেই কেটে যায়। প্রতিবারই মেঘোরী নানা পরিকল্পনা করে নিঃসঙ্গ দুপুর গুলোতে। কিন্তু যতই পুজোর দিন গুলো কাছে আসতে থাকে, বাড়তে থাকে ব্যস্ততা। এসব ভেবেই সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে অমিত বলেছিল,

– এবার আর ঘর ঝাড়তে যেও না মেঘু, প্লিজ; তোমার এলার্জিটা আবার বাড়বে গত বারের মত।

ধুলো বালিতে মেঘোরী এলার্জি। চোখ জ্বালা করে, হাঁচি হয়, নাক দিয়ে জল ঝরে। রাতে মাথা আর চোখ ব্যথা। বাজে অবস্থা। কিন্তু ঘর ঝাড়া মেঘোরীর কাছে একটা ঐতিহ্যের মত। সেই ছেলে বেলায় সে তার মাকে দেখেছে, আটপৌড়ে শাড়িটা মাজায় জড়িয়ে বিপুল উৎসাহে তাদের পুরোন বাড়ি ঘর ঝাড়তে। পুরোন ঘর মানেই প্রচুর ধুলো-বালি, পুরোন জুতো, ব্রাশ, ছেঁড়া মোজা, ফিতে কাটা স্পঞ্জ, চুলের ফিতে, ইলাশটিক ঢিল জাঙ্গিয়া, হুক ছেঁড়া ব্রা হাবিজাবি আরো কত কি–

তারপর জল দিয়ে ঘরের মেঝে ধুয়ে দেওয়ার পর পুরোন ঘর বাড়িকে নুতনের মত দ্যাখাত। সন্ধ্যায় ধুপের গন্ধ পুজো আবহ সৃষ্টি করত।

তারপর থেকে নিজ সংসারে প্রতি বছর মেঘোরী পুজোর আগে বিশেষ করে মহালয়ার আগের দিন ঘর ঝাড়ে মুছে একবারে নতুন করে ফেলে। মেঘোরী উত্তর করে, ঘর বাড়ি

পরিচ্ছন্ন না থাকলে মা দূর্গা আসবেন কোথায়? কিন্তু মা দূর্গা তার দূর্গতি বিনাশ করতে আসেন না। অমিত জানে মেঘোরী বেশ ভক্তিমোতি মেয়ে, তাই কথা না বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। সামান্য আপত্তি করলেও অমিতের প্রবলতায় সে সামান্য আপত্তি ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর মত ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তারা দুজনে মন্দাকিনীর ঢেউ এর দোলায় দুলতে থাকে দুলতে থাকে ... ...

এভাবেই কাটছে অমিত ও মেঘোরীর এগার বছর সাত মাসের দাম্পত্য জীবন। এখনো ওরা কেউ কারো কাছে পুরোন হয়নি ঠিকই, কিন্তু তারা তিনজন হতে পারেনি এখনো। গতমাসে অমিত এক ডাক্তারের সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসে বলেছিল,

– আজ বিকেলে ডাঃ খান এর কাছে যাব ভাবছি; এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি; তোমার আপত্তি আছে?

ডাঃ খানের নাম মেঘোরীর জানা। এ বিষয়ে তিনি একজন বিখ্যাতজন। মেঘোরী একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল,

– না, না এতে আপত্তির কি আছে।

– তাহলে তুমি তৈরি থেক, আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরব।

সেদিন ভীষন বিষন্নতায় ডুবেছিল ওরা দু'জন। এক অজানা শংকায় নীল হয়ে ছিল তারা। বাসায় মেঘোরী কোন কিছুই মন দিতে পারেনি; না টেলিভিশনে, না মান্না দের গানে। অন্য দিকে নানা উৎকণ্ঠায় কেটেছে অমিতের সারাটা দিন। তারপর ও অমিত বাসায় সেদিন তাড়াতাড়িই ফিরেছিল। মেঘোরীও ছিল তৈরি। অমিত বলল,

– তুমি তৈরি মেঘু ?

– হ্যাঁ।

– তাহলে যাওয়া যাক।

–চল।

দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে মেঘোরী লক্ষ্য করল তার হাত কাঁপছে। অমিত ও কিছুটা অসংলগ্ন। তারপর সি,এন,জি তে যেতে পথ পাল্টে ছিল অমিত। নাহ, অমিত সেদিন ডাঃ খানের চেম্বারে যায়নি। ফুচকা খেয়ে সংসদ ভবনে বসে, চারু কলার সামনে ছবির হাটে পুরনো বন্ধুদের সাথে চা খেয়ে, আড্ডা দিয়ে রাত করে বাসায় ফিরেছিল তারা। মেঘোরীও ডাঃ খানের চেম্বারে যাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করেনি। বাসায় ফিরতে ফিরতে অমিত বলেছিল,

– গেলাম না ব্যাটার কাছে; কি লাভ আমাদের নিজেদের মধ্যে হার জিতের; প্রবলেম আছে হয় তোমার অথবা আমার; প্রয়োজন কি এটা প্রমাণের!

আবেগে মেঘোরী ওর হাতটা জড়িয়ে নিঃশব্দে কেঁদেছিল কিছুক্ষন। ওরা যখন বাসায় ফিরল তখন বেশ রাত। তারপর বিছানায় গিয়ে সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে যায় অমিত। মেঘোরীও সেদিন অসম্ভব ভালবাসা নিয়ে অমিত কে পশ্রয় দিয়েছিল। এসবই হল তার যাপিত জীবনের খন্ড চিত্র, যা সময় অসময়ে মেঘোরীর স্মৃতিতে উড়ে আসে। কিন্তু এখন অনেক কিছু দেখেও মেঘোরী অমিতের জন্য গিফট পছন্দ করতে পারছে না। বডি স্প্রে, টাই, ট্রাউজার, আফটার সেভ --- সব কিছুই কেমন জানি খুবই সাধারণ মনে হচ্ছে তার কাছে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মেঘোরী আবার কিছুটা উদাস হয়ে একটা সো পিচ দেখতে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে একজন বলে উঠে, আরে দয়ী না?

'দয়ী' শব্দটা মেঘোরীর শ্রবণ ইন্দ্রিয় ভেদ করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে মূহুর্তে। এই জীবনে একমাত্র একজনই এই নামে তাকে ডেকেছে, আর তার প্রতিটা ডাকে ছিন্ন-বিছিন্ন হয়েছে মেঘোরী সাদামাটা পৃথিবী। তারপরও এই ডাকটা শোনার জন্য চাতক পাখির মত মেঘোরী অপেক্ষা করত অহর্নিশি। আর হৃদয়ে শিহরণ জাগান মানুষটি ছিল তালাত। আজ এতদিন পর এই পরিচিত সম্ভাষন শুনে ভুতে ধরা রোগীর মত কেঁপে উঠেছিল সে। পাশ ফিরতেই একজন সুঠাম দেহী সুদর্শন পুরুষ এগিয়ে এসে বলল,

– কিছু মনে করবেন না; ইয়ে মানে, তুমি দয়ী না?

মেঘোরী প্রথম নজরে তালাতের দিকে তাকাতে পারে না। তার কণ্ঠস্বরই ইতিমধ্যে তাকে তীরবিদ্ধ পাখির মত গেঁথে ফেরেছে। তালাতের দিকে না তাকিয়েই মেঘোরী বলে উঠে,

– তালাত তুমি কোত্থেকে?

– দয়ী, তুমি তো দেখি আগের মতই সেক্সী আছো!

লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠে সে। চোখ তুলে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নেয় মেঘোরী; তারপর বলে,

– পাল্টাও নি দেখছি।

হা হা করে প্রাণ খোলা হাসি দিয়ে চারপাশ সচকিত করে তালাত বলে উঠে,

– নাহ; পাল্টা তে আর পারলাম কই;

– কোথায় ছিলে এতকাল?

– ছিলাম না, আছি; এখন কানাডায় আছি। ছুটিতে এসেছি; সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ফ্লাইট। তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল। তারপর, কি খবর?

– ভাল;

– তোমার বর কই?

– তা, দিয়ে তোমার কি দরকার? বিয়ে করেছ?

চমৎকার একটা হাসি দিয়ে তালাত বলে;

– না করলে কি, তুমি করবে?

এক চিলতে হাসির রেখা খেলে যায় মেঘোরীর ঢেউ খেলানো পাতলা ঠোঁটে।

মেঘোরী বলে,

– বেশ আছো দেখছি; কি কর ওখানে? ড্রেন ক্লিনার?

– আরে নাহ। তোমার ছানা-পোনা কটি? ওরা কই?

এবার মেঘোরীর নৌকার ছেঁড়া পালে লাগে দমকা হাওয়া। এ ধরনের প্রশ্নের প্রায়ই উত্তর করতে হয় তাকে। কিন্তু এক সময়ের নিজের স্বপ্নের পুরুষের সামনে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না তার। মনের মাঝে স্মৃতির ইলশিগুড়ি শুরু হয় মেঘোরীর। আর সেই ইলশিগুড়িতে ঝাপসা হয়ে আসে তার বর্তমান।

সাল তারিখ মনে নেই মেঘোরীর। কলেজের ফাসর্ট ইয়ার। পরিচয় হল তালাতের সাথে। তালাত তখন আরো উচ্ছ্বল, আরো ছটফটে। তারপর মেঘোরীর প্রেম অবশ্য সে প্রেম ছিল কিছুটা এক তরফা--- আবার একেবারেই যে এক তরফা সেটাও কী ঠিক ? তালাত মেঘোরীকে ডাকতো দয়ী বলে। পৃথিবীর সব একদিকে অন্য দিকে তালাতের সেই প্রাণভরা সম্মোধন। তখন মেঘোরীর মনে হত, 'দয়ী'-ই সত্য 'মেঘোরী' মিথ্যা। মনে হত এ জীবনে আর যাই হোক, অন্তত একবার একবার তালাতের স্পর্শ মৃত্যুর পর লক্ষ বছর স্বর্গবাসের থেকেও অনেক কাঙ্খিত। তবে, এখানেও মা দুর্গা দয়ী-র সহায় হননি। হয়েছিলেন মেঘোরীর পক্ষে। বিভিন্ন কারণে বিশেষত ধর্মীয় কারণেই তালাত দয়ীর হয়ে উঠেনি। তালাত হয়ে থেকেছে স্বপ্নের দেখা স্বপ্ন দেশের রাজপুত্তুর হয়ে। আর প্রজাপতি ঋষির আর্শীবাদে মেঘোরী দিনাজপুর বাসী এক ব্যাংকারের চারপাশে সাতপাক ঘুরে তার গলায় নেতিয়ে যাওয়া রজনীগন্ধার একটা ঢাউস মালা পরিয়ে, পবিত্র পানপাতা সরিয়ে শুভদৃষ্টি সম্পন্ন করেছিল গোধূলী লগ্নে। তারপর এতটা সময় ....

মেঘোরী এখন "মেঘোরী" হয়েই সুখী। তার মনের বারান্দায় এখন ঝলমলে রোদ

খেলা করে সকাল দুপুর বিকেল। রাতে ঝিরিঝিরি জোসনা। কিন্তু, তারপরও কোন উদাসী দুপুরে, অথবা ঘুম ভাঙ্গা কোন মধ্য রাতে স্বপ্ন দেশের রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আজো আসে। তার মুখ ঢাকা থাকে মেঘ আর জোসনার চাদরে। সে চারপাশের বিষন্নতা কে খানখান করে ডেকে উঠে, ''এই দয়ী... ....

প্রসঙ্গ পাল্টাতে তালাত বলে, আমার সেল নম্বর টা নাও, আর তোমার টা দাও; যদি তোমার আপত্তি না থাকে। বলেই সে তার এ্যাপেল -এর আই ফোনটা বের করল ফোন করার জন্য। সম্মোহিত মানুষের মত নিজের সেল নম্বর ধীরে ধীরে বলে গেল মেঘোরী। ০১৭১৫........ চলে যাওয়ার আগে তালাত বলল,

– নতুন একটা ফ্লাট কিনেছি; এই নিউ মার্কেটের পিছনেই; মাথা গোজার একটা ঠাঁই তো দারকার। রোড নং- ১০৭ ১২/সি পুরাতন.....

আরো কিসব যেন ও বলল, কানে ঢুকল না মেঘোরীর; তার মনে হতে লাগল, আসলে সত্য কোনটি 'দয়ী'? না 'মেঘোরী'? আবার মনে তার ইলশেগুড়ি ঝড়তে থাকে; সাথে দমকা বাতাস ... .

মেঘোরীর গিফট পছন্দ করা হয় না। নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিল সে। মনের মধ্যে জমা সমস্ত আবেগ হঠাৎ যেন বেরিয়ে আসতে চাইল তখুনি। চোখটা জ্বালা করে উঠে মেঘোরীর। আর সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে, আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে "দয়ী" নাম ধরে অদৃশ্য কেও একজন চিৎকার করে ডাকতে থাকে। দু'হাতে কান ডেকে ঝাপসা চোখে মেঘোরী দেখে, শরতের আকাশটাকে আজ আকাশটা যেন অনেক বেশী সুন্দর, মায়াময় আর নষ্টালজিক দেখাচ্ছে।

পরবর্তী দিনগুলো মেঘোরীর কেটে যেতে থাকে অলসভাবে। তারপর একদিন কাজহীন দুপুরে, নিশী পাওয়া মানুষের মত মেঘোরীর রিক্সা এসে থামে তালাতের ঝাঁ চকচকে ফ্লাটের সামনে। যন্ত্রচালিত মানুষের মত কলিং বেলে হাত রাখে মেঘোরী। আর তখুনি চারপাশের আকাশ বাতাস একসাথে 'দয়ী' 'দয়ী' বলে চিৎকার করে উঠে। সামান্য কিছুক্ষন বাদে দরজার একপাট খুলে হাসি মুখে তালাত বেরিয়ে এসে বলে উঠল, 'আরে দয়ী যে– আমি জানতাম তুমি আসবেই। সামান্যতম বিস্ময়ের লেশ নেই তার মধ্যে। একজন দয়ী-র উপর একজন তালাতে এতটা আস্থা কিভাবে জন্মায়– ভেবে পায় না দয়ী।

দুপুরের রোদ দামী রঙ্গিন কাঁচের মধ্য দিয়ে মেঘোরী-র গোলাপী শাড়ির আঁচল ভাসিয়ে দেয়। সেই আলোর আভার সাথে একা কার হয়ে যায় দয়ী'র লজ্জা অবনত দ্বিধা। খুব সহজ ভঙ্গিতে তালাত বলে উঠে,

–ভিতরে এস।

ভিতরে প্রবেশ করে অবাক হয় দয়ী; আগের সেই উচ্ছল চঞ্চল ছেলেটা এতো গোছাল হয়ে উঠল কবে?

এক সময় তালাতের অগোছাল চুলে হাত বুলাতে ইচ্ছা করত তার। আজ সেই তালাত এখন ভীষন গোছাল পরিপাটি। তালাত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে দরজার ছিটকানি লাগাতে লাগাতে বলে উঠল,

– বরাবরই তোমাকে গোলাপীতে সুন্দর লাগে, তবে আজ যেন বেশি সুন্দর লাগছে। কি নেবে দয়ী চা না ঠান্ডা?

এ মূহুর্তে তালাতের মুখে "দয়ী" শব্দটি চার দেওয়ালের মাঝে ধাক্কা খেয়ে রক্ত মাংসের দয়ীর মধ্যে এক অস্বাভাবিক অনুরণন তৈরি করে। আর সেই ধাক্কায় দয়ী হুহু করে কেঁদে ফেলে। আচমকা এই কান্না তালাত কে বিমূঢ় করে তোলে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দয়ী বলে,

–তালাত, আমাকে মুক্তি দাও; আমি আর পারছি না; তোমাকে ভুলতে চাই– আর তোমারে ভুলে যাওয়ার জন্য, এখানে আসা ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই তালাত....

....

তালাত বলিষ্ঠ হাতে দয়ী কে জড়িয়ে ধরে। ধীরে ধীরে তালাতের ঘরে লক্ষ লক্ষ হাসনা হেনা ফুটে উঠে; সুখের মন্দাকিনীতে জোয়ার আসে কলশব্দ গীতে! ছোট-বড় ঢেউ খেলতে থাকে---- আর সেই তরঙ্গে ভাসতে থাকে আদিম দু'টো নর-নারী।

তৃপ্তির আবেশে দয়ী তালাতের খোলা ফর্সা পিঠে, নখের আঁচর বসিয়ে দেয়– ভারি হয়ে উঠে দামী কাঁচ আর পর্দা ঘেরা ঘরের বাতাস আর আরো মায়াময় হয়ে উঠে বাইরের প্রকৃতি।

এক সময় ক্লান্ত হয় এই আদিম নর-নারী। চুলের গোছে ঠিক করতে করতে হঠাৎ দয়ী হিশ হিশ করে বলে উঠে,

– আমি হারতে হারতে জিতে গেলাম তালাত; আজ 'দয়ী'-র মৃত্যু ঘটল। বেঁচে রইল শুধু মেঘোরী। মেঘোরীর চৌহদ্দীতে আর কোন দিনই দেখা যাবে না, 'দয়ী' অথবা 'তালাত'-কে।

তালাত কে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে মেঘোরী আরো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠে,

– তালাত, তুমি আর কোনদিনই ‘দয়ী’-র সাথে যোগাযোগ করবে না। দয়ী নেই; আছে মেঘোরী। শুধুই মেঘোরী... ... ...

সজরে দরজাটা বন্ধ করে, মেঘোরী বেরিয়ে এসে একটা রিক্সায় উঠে। নিজের সাথে যুদ্ধ করে এখন সে ক্লান্ত। বড় ক্লান্ত। ভিতরের জমে থাকা অপরাধ বোধ, অভিমান, যন্ত্রণা আর অস্বস্তি গোঙাঁনী আর ফোফানি হয়ে গলায় উঠে আসে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না চাপতে পারছে না মেঘোরী। শরতের আকাশে আজো তুলো মেঘ ভেসে যাচ্ছে অজানায়। শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা বাতাস আছড়ে পড়ে মেঘোরীর কোলে-মুখে-বুকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘোরী মনে হয় দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গেছে। উৎসব আসন্ন; আনন্দে মুখরিত চারপাশ। তবুও নিজেকে সামলাতে পারছে না সে। রিক্সার ঝাকিতে সে একটু জোড়েই ফুপিয়ে উঠে। সামনের রিক্সাকে টপকে যেতে যেতে রিক্সাআলা ঘাড় ঘুড়ে তাকায়; বলে, – কাঁইদেন না আফা; সব কিছু ঠিক হয়া যাইব, ইনশাআল্লাহ ... ...

বড় শান্তনা পায় মেঘোরীর মনে হয় এই কোলাহল পূর্ণ ব্যস্ত পৃথিবীতে নিতান্তই সে একা নয়।

চক্রব্যূহে আটকে থাকা অবয়ব

জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর হোসেন গলাটা আরো একধাপ নিচে এনে জড় হওয়া এক রাশ কঙ্গাল সার মানুষ গুলোকে বোঝাতে লাগলেন; বললেন, দেখুন, আমাদের সরকারের ওপর তলায় একটা রিপোর্ট পাঠাতে হয়– এবং আমরা সেটা অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে আপনাদের এই পূজার কথা বলা হয়েছে– আর এই শেষ বেলায় যদি আপনারা পুজো টা না করতে চান ...

মনোহরপুরের হরিজন পাড়ার এই দরিদ্র মানুষ গুলো যে পুজা করতে চায় না তা কিন্তু নয়। বরং, তারাই এই বার দূর্গা পূজো করতে ভীষন আগ্রহী। গ্রামের এই নিচু জাতের দারিদ্র পীড়িত, রুগ্ন মানুষ গুলোর জীবনে আনন্দ বলে কিছু নেই। সারা বছর সমাজের উঁচু তলার মানুষ গুলোর লাথি-ঝাঁটা আর করুনা নিয়ে আধ পেট খেয়ে কোন মতে বেঁচে থাকে এরা। এদের আনন্দ বলতে কোরবানী ঈদ। সেই দিন এই হরিজনপাড়া মৌ মৌ করে বিভিন্ন বাড়ি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মাংসের গন্ধে। পাড়ার রোগা পটকা অসুস্থ শিশু গুলো উঠানের চুলার পাড়ে গোল হয়ে বসে। ওরা চকচকে চোখে হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। এই দিনে তারা পেট পুরে খায়। বয়স্করা সবাই মিলে গাঁজা টানে আর কাশে। প্রাণ পণে কাশে। কাশতে কাশতে ওদের চোখ গোল হয়ে যায়, দম পায় না, বুক ধরে কাশে ওরা। তারপর বুকের গভীর থেকে বিরয়ে আসে পুরনো সর্দি। থু করে উঠানের এক কোনে ফেলে ওরা; তারপর আবার কলতে তে টান দেয় নুতন উদ্যোমে। বৌ গুলো শহরে গিয়ে রাস্তা ঝাড়ু দেয়। তারা কাজে যায় সন্ধ্যার পর। চুল বেধে; কায়দা করে কাপড় পড়ে মুখে জরদা দেওয়া পান দিয়ে দল বেধে গ্রামের ধুলো ঢাঁকা সরু পথ ধরে। ওরা চলে যাওয়ার পরত বাতাসে জরদার গন্ধ পাওয়া যায়। ওদের হাতে লম্বা লাঠি লাগানো ঝাঁটা। ওদের চলার ঠমক আর ছোট ব্লাউনের নিচে প্রতিবাদী যৌবন পথের চলমান লোকজনের দৃষ্টি কাড়ে। রাতে কাজের ফাঁকে অনেক কে সন্তুষ্ট করতে হয় ওদের; নাইট গার্ড, বখাটে, চোর এমনকি টহল পুলিশও। বাড়তি কিছু আয় করে সকালের আলো ফোটার সাথে সাথে ওরা ফিরে আসে ভৈরব নদের ঘোলা জলে স্নান সেরে শূচি হয়; তারপর বাড়ি ফেরে ওরা। তখনো ওদের অল্পতে হাঁপিয়ে ওঠা স্বামী গুলো নাক ডেকে

ঘুমায়। গাঁজার ঘোর তখনো কাটে না ওদের। এভাবেই মনোহরপুরের হরিজন পাড়ার অস্পৃশ্য মানুষ গুলোর অলস জীবন কেটে যায় জন্ম মৃত্যুর আবর্তে।

এই মানুষ গুলো এবার ঠিক করেছে দূর্গা পূজো করবে। এই পূজো হবে নেতাদের টাকায়। উদ্দেশ্য ভোট। আর মধ্যে থেকে চাঁদা হিসেবে কিছু বাড়তি পয়সা তুলতে পারলে, আর কিছু খরচ বাঁচাতে পারলেই কটা দিন নিশ্চিন্ত মনে ক'দিন বাংলা মদ খাওয়া যাবে-- মূলত এই চিন্তা থেকেই এই পূজোয় তাদের এত আগ্রহ। কিন্তু শেষ মূহুর্তে পূজোটা হয়ে উঠছে না। মানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কোন বিধান দিতে পারছেন না পুরোহিত ভট্টাচার্য মশায়। তিনি মুকুল দাস, জয় ভুঁইমালী, ভজা দাস, বাবু মেথর, লালু ভুঁইমালী'র হতবিহবল নির্বাক মুখ গুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন,
– কিন্তু, হুজুর এই পুজো সুন্দরের পুজো। দেবীর পূজা। কিন্তু সেই দেবীরই মাথা নেই। কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এমতাবস্থায় আমি কি বিধান দেব হুজুর.... তাছাড়া অঙ্গহানী বিগ্রহের পূজা শাস্ত্রে নিষেধ আছে...
ভট্টাচার্য মশায় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যজমানী পুরুহিত। তিনি এখানে এসেছেন নগদ পাঁচ হাজার টাকার লোভে। এসেই ফেঁসে গেছেন বড় সমস্যায়।
জেলা প্রশাসক যে অসহায় বোধ করছে [illegible]। তবুও তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। এই ছোট লোকের বাচ্চা গুলোর সামনে দাঁড়াতেই তার এখন ঘেন্না হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, এদের শরীর থেকে দূর্গন্ধ আসছে। তারপরও স্বাভাবিক গলায় বললেন,
– ঠাকুর মশায়, সরকার পুজার সংখ্যা বেশী দেখতে চান। তাছাড়া আমরা সকলেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে চাই। এই ঘৃণ্য কাজ যে করছে তার তদন্ত চলছে। দুর্বৃত্ত বা সন্ত্রাসী সে যে দলেরই হোক না কেন বিচার তার হবেই– কিন্তু এই শেষ মূহুর্তে পুজো না হলে– আর প্রেসের লোকেরা তো আছেই;
আপনি একটু ব্যবস্থা করুন, প্লিজ ....
সমবেত হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরাও চাইছে পূজা হোক। কিন্তু তাদের সমস্যা শাস্ত্রীয়। সেকারণে তারাও চুপ। তাদের ধারণা এখন এই কাজ করার অর্থ হলো মহা পাপ করা। এই অধর্ম করে গুষ্টি শুদ্ধ ওলাওঠাতে মরে কাজ নেই। অন্যদিন সামান্য আনন্দ আর হিসাব ফাঁকির পয়সায় কদিন চুটিয়ে বাংলা মদ গেলা বুঝি ভেস্তে যেতে বসেছে। তবুও

ওরা চুপ। সমাজের উঁচু তলার মানুষ গুলোর মুখের ওপর কথা বলার অভ্যাস নেই ওদের। তাছাড়া পুরোহিত তো আছেনই; তিনি শাস্ত্র বোঝেন তিনিই কথা বলবেন, আর এই সমস্যার প্রথম থেকেই তিনি উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনাটা পুরোহিত মশায় দেখতে পান আলো আঁধারে। ষষ্ঠী-র রাত। মা'র বোধনের লগ্ন রাত বারোটায়। এদিকে পুজার কোন ব্যবস্থা হয়ে উঠেনি। এরা এসব বোঝেও না, আর এদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়েও আসেনি। তিনি এখন ভাবছেন-- ব্রাহ্মণী কে আনলে ভাল হত। হাতে-পাতে জোগাড় ও দিতে পারত। আর এই আনন্দ উৎসবের দিনে সেও একা একা মন খারাপ করে থাকত না। এদিকে এস.পি সাহেব আলো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন পর্যন্ত হরিজন পাড়ার মা দূর্গা আলোর বন্যায় ভাসেনি। আলোর উচ্ছ্বাস বইছে শহরের ভদ্রপাড়ার মন্ডপ গুলোতে। সেখানে ধর্ম পাগল মানুষ গুলোর মধ্যে, ভক্তি আর ভালবাসার প্লাবনে মা দূর্গতিনাশিনী ভাসছেন আহাল্লাদী হয়ে। আর এই হরিজনপাড়ার মন্ডপ অন্ধকার। ঠাকুর মশায়ের পক্ষে একা একা পূজার জোগাড় দেওয়া এই বয়সে বেশ কঠিন। দূর্গা পূজাতে উপোষ থাকতে হয় পুরোহিতকে। অবশ্য ভট্টাচার্য মশায় উপোষ নেই– ছোট জাতের পূজো, তার আবার উপোষ! পুরোহিত মশায় একা একা কাজ করেন আর গজ গজ করতে থাকে আপন মনে– “দূর্গা পূজা কি শহর কথা! এ হলো মহাযোগ্য! এ পূজা এক সময় করেছিল, তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ন। হাজার হাজার টাকা খরচ সেই পুজোতে; খরচ দেখে সাহেবরাও হা হয়ে গিয়েছিল– সেটা হলো পুজো!” এখন লগ্ন বয়ে যাচ্ছে; মায়ের বোধন পূজা করতে হবে, সেটায় মূল কথা। অবশ্য এই এখানকার লোকেরা লগ্ন সম্পর্কে খুব বেশী জ্ঞান রাখে না; তবুও একটা ন্যায় অন্যায় বলে কথা আছে না– সে কারণেই ভট্টাচার্য মশায় আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পুজোর জোগাড় দিতে দিতে আলো আধারে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রতিমার মাথা নেই। অর্থাৎ দূর্গা প্রতিমা সহ লক্ষী সরস্বতী দেবীর মাথা কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে অথবা কোথাও ফেলে দিয়েছে; মোট কথা দেবীর মাথা নেই। মহা ষষ্ঠীর লগ্ন আরম্ভ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এখন তিনি পূজা শুরু করবেন কি করে। সুন্দরের পূজা করতে এসে, সে কি অসুর পুজো করবে? হারিকেন, ছোট চার্জার আর টর্চের আলোয় আয়োজকরা সকলে দেখলো দেবীদের মাথা ভাঙ্গা। মানে, পুজো হচ্ছে না! কিন্তু সকলেই নির্বাক!

অবশ্য এরা নির্বাক-ই থাকা সব সময়। এইতো সেদিন লাটু ভুঁইমালির সমত্ত মেয়েকে একদল বখাটে পাট ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ...

মেয়েটা সেদিন শেয়ালে ধরা হাসের মত পাখা দাপিয়ে, চেঁচিয়ে কাউকে জড় করতে পারেনি। তারপর পাড়ার সকলে কিছুটা গো গো করে সবাই চুপ হয়ে যায় যথা নিয়মে। ক'দিন আগে হরিজনপাড়ার শ্মশান ঘাটটা দখল করে নিয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের একপান্ডা। গত মাসের বিষ খাওয়া লাশ নিয়ে গিয়ে ওরা সৎকার করতে পারে না। অপেক্ষা করতে হয় উঁচু তলার মানুষের হুকুমের জন্য। শক্ত লাশ আরও শক্ত হয়; দূর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। ক্ষোভ দানা বাঁধে ওদের মধ্যে ... তারপর একসময় চুপ হয়ে যায় ওরা। মাথা বিহীন মূর্তি ... দেখে যখন সবাই নির্বাক তখন আকন্ঠ চোলাই গিলে বাবু মেথর, বেশ সবর। চিৎকার করে গরম করে তোলে সাড়া পাড়া। বাবু খিস্তি করে বলে, "ধ্যাৎ, যে দুগ্‌গা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না- সে আমার মত মেথরদের কি রক্ষা করবে- আঁ্যা আর দুগ্‌গা হল শহরের। যারা সেখানে থাকে তারাও কত সৌন্দর্য আহা! ওদের পেট গুলো কি ফর্সা ...

বাবু মাতালের কথায় কেউ কান দেয় না। সকলে চুপ থাকে। কিন্তু এই মৌনতার মাঝেও শহরে নিমিষেই এই খবর পৌঁছে যায়। ডি,সি সাহেব, এস,পি সাহেব, পুলিশ, আরো বড় বড় সাহেব এই প্রথমবারের মত এই গরীব পাড়ায় স্বশরীরে এসে দাঁড়ায়। মনোহরপুরের হরিজনরা দূর্গতিনাশী দেবী দূর্গার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়। হোক না তা মাথা বিহীন, বাবু মাতালের ভাষায় দূর্বল, ভীরু নিজেকে রক্ষায় অক্ষম- তবুও তাদের মনে হয়, এই দূর্গতিনাশিনীর কৃপাতেই এই মহারথীরা শহর থেকে এতটা পথ বেয়ে, এত রাতে তাদের কাছে এসেছেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার প্রসেই পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলেছেন। তার মধ্যে চলছে পুরোহিত মশায়ের সাথে কথা। এখন যেন ক্লান্ত বোধ করছেন জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর হোসেন। এস.পি সাহেব, গিয়াস উদ্দিন এগিয়ে এলেন। বল্লেন,

ডিসি সাহেব আপনি ছাড়ুন আমাকে দেখতে দিন একটু; বলেই তিনি ওসি সাহেবকে ধমকের সুরে ডাকলেন,

– এ্যাই ওসিঃ

– স্যার।

– কি কর তুমি শালা, বাইনচোদ...

– স্যার।

– বাঁধ এই শালা মালোয়ানের বাচ্চা কে। প্রথমে ধোলাই কর খানিক। তারপর এই

বুড়োর ছেলে থাকলে নিয়ে আস, ধোলাই কর– তারপর মূর্তি ভাঙ্গার চার্জ এনে চালান দে শালাকে–

– স্যার, ইয়েস স্যার।

ওসি আব্দুল জলিল যন্ত্রচালিত পুতুলের মত স্যালুট করে পিছন দিকে ঘুড়ল। আর তখুনি পুলিশ সুপার তার দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে, নিজে জ্বালানোর আগে ডি,সি সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "চিন্তা নেই, কাজ হবে"। জাহাঙ্গীর সাহেব ধুমপান চলে না; তারপরও তিনি সিগারেট নিলেন কিন্তু জ্বালালেন না। ঘটনা দেখে পুরোহিত মশাই এর অবস্থা বেগতিক। ইতিমধ্যে দুই পুলিশ তার শীর্ষ দুই বাহু চেপে ধরেছে। ভট্টাচার্য মশায়ের তলপেটে ভীষন সুড়সুড়ি অনুভব করলেন। তার মনে হচ্ছে সকলের সামনেই 'ইয়ে' হয়ে যাবে ... তারপরও সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তিনি বললেন, "হুজুর, আমি যজমানী ব্রাহ্মন, হুজুর আমি! হুজুর!" – বলতে বলতে এস.পি সাহেবের পায়ে পড়লেন। সমবেত লোকেরা একজন ব্রাহ্মনের এই দূর্গতি দেখে লজ্জা আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ মনে মনে ভাবল, যাক, মা দূর্গার মাথা না থেকে ভালই হয়েছে; মাথা থাকলে মা হয়তো নিজেই লজ্জা পেতেন এই দৃশ্য দেখে।

এস.পি. গিয়াস উদ্দিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে, উদাস হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পুজো কি হবে? শাস্ত্রে কি বিধান পাওয়া যাবে এখনি পুজো করার?" ভট্টাচার্য মশায় এই ইশারাটা সহজেই বুঝলেই এবং দ্রুত বললেন, "আজ্ঞে হবে হুজুর, অবশ্যই হবে।" বলে তিনি চোখের জল মুছলেন। আর মনে মনে সেই শক্তিদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী, দূর্গতিনাশিনীর পায়ে ক্ষমা চাইলেন।

হৃষ্ট চিত্তে এস.পি. গিয়াস উদ্দিন বললেন, "পুজা শেষে পুরোহিত মশায়, আমার পক্ষ থেকে দুই হাজার টাকা বকশিস নিয়ে যাবেন।" তারপর ওসিকে গাড়ি ঘোড়ানোর জন্য আদেশ দিয়ে ওয়ারলেস এ কি যেন জরুরী কথা সেরে ডিসি সাহেব কে হালকা মেজাজে বললেন,

– দেখলেন তো, বকশিস শুধু পুলিশ নয়, এদেশের সবাই, এমনকি পুরোহিত মশায়ও বকশিস খায়– যাকে দুষ্টুরা ঘুষ বলে– হা হা হা, এবার চলেন...

দুই

এরপর পুজো শুরু হতে দেরী হয় না। মাটির প্রতিমার মাথায় একথাল কাঁচা মাটির সাথে একটা করে দেবীর ছবি জড়িয়ে আর সামনে একটা ছোট মাটির ঘট বসিয়ে দিয়ে শুরু হয়ে যায় দূর্গা পূজো।

যতটা আনন্দ আশা করেছিল এই মানুষ গুলো এখন আর তা বোধ করছে না তারা। পুরোহিত মশায় পুজো করতে গিয়ে বারবার হয়ে পড়ছেন বিষন্ন... এলমেল হয়ে যাচ্ছে তা কাজ। আজ দীঘদিন ধরে এই কাজ করে আসছেন তিনি; কিন্তু এমনটি এই প্রথম। গ্রীস্মের দুপুরের উদাসী বাতাসে ভেসে আসা শুকনো পাতার মত উড়ে আসছে নানা চিন্তা তার মাথায়। ভট্টাচার্য মশায়ের মনে হচ্ছে হাজার বছর ধরে এই পুজো করেছে সনাতনীরা। সুন্দরের কাছ থেকে শক্তি চেয়েছে অসুন্দরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু তবুও তারা এখনো এত দূর্বল কেন? কেন তারা এত অসহায়? অভাব আর দারিদ্র কে সাথে নিয়ে আপোষ করে বেঁচে থাকে...? এরূপ হাজার প্রশ্ন তার একাগ্রতাকে নষ্ট করছে। ভট্টাচার্য মশায় লক্ষ্য করলেন, সমবেত দর্শনার্থীরা সকলেই শীর্ন, হাড় জিরজিরে কঙ্কাল সার দূর্বল অভাবী! জীর্ণ কঙ্কাল সার শিশু গুলো সবাই অসুর টারকে দেখছে– অসুরের মাংসপেশী গুলোকে দেখছে– অসুরের পুরুষালী চেহারা আর প্রতিবাদী চাহুনী তাদেরকে বিস্মিত আর হতবাক করছে। বয়স্করাও দেবী মূর্তির কামউদ্দীপক শরীর ছেড়ে অসুরকে দেখছে। অসুরের মাংসপেশী, তার প্রতিবারদের ভাষা, লড়াই ও তার মৃত্যু সমাজের এই দলিত মানুষ গুলোকে আকৃষ্ট কোন কারণ ছাড়া। তাদের মনে হচ্ছে, অসুরের মত তারাও পরে আছে সকলেই পায়ের নিচে; তাদের মত অসুরও অমর নয়– তারপরও অসুর কত প্রতিবাদী– সে লড়ছে। লড়ছে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও....

বাবু মাতাল, চিৎকার করে বলে বেড়াচ্ছে, "কেউ অসুরের মাথা কাটতে পারে না– অসুর কে কেউ মারতে পারে না– দূগ্গা কে মারে; তার মাথা কাটা পরে– হা হা হা....."

বাবু মাতালের এই হাসি চারপাশের বাতাসে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হতে থাকে। তার কথাতে কেউ কান দেয় না। মন্ডপের নিরাপত্তায় নিয়জিত পুলিশ আর আনসার গুলো শুধু হাসে। কিন্তু কথাটা যেন পুরোহিত ঠাকুরের মগজের ভিতর গিঁথে যায়– বারবার একই কথা ঘুরতে থাকে পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মত। তার মন্ত্র আবার এলোমেল হয়ে যেতে থাকে। এক সময় পুরোহিত মশায় পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ান। আরতির জন্য।

পঞ্চ প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সেই আলোয় দেবীর মুন্ডুহীন শরীর চকচকে হয়ে উঠেছে। আর এই সামান্য আলোয় আরো পুরুষালী হয়ে উঠেছে অসুর মূর্তিটা। তার ঘমাক্ত লোমশ বুক পঞ্চ প্রদীপের আলোয় আরো চকচকে দেখাচ্ছে। আরতি চলছে অন্ধকারে নিমজ্জিত মনোহরপুরের হরিজন পাড়ার দূর্গা মন্ডপে। পুরোহিত মশায়ের বাম হাতের ঘন্টা বেজে চলেছে বিরামহীন। কিন্তু ঢাক নেই। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে এক হল্লা। মহাঅষ্টমীর এই আনন্দ ঘন মুহুর্তে এই মানুষ গুলো মেতেছে শুয়োর শিকারে। একটা বৃহৎ আকৃতির শুয়োর কে সকলে মিলে ট্যাঁটা, ফালা আর বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করছে। আর প্রবল আনন্দ উত্তেজনায় চিৎকার করছে।

জন্তুটা পালাতে পারছে না; কিন্তু বাঁচার জন্য লড়ছে সে প্রাণ পনে। চারদিক থেকে শুয়োর টাকে আক্রমণ করছে মানুষ গুলো; জন্তুটা দাঁত বের করে, গা ফুলিয়ে, অযথা গর্জন করছে আর বাঁচার চেষ্টা করছে।

ভট্টাচার্য মশায়ের মনে পড়ে যায়, এই অষ্টমী নবমী তিথিতে শ্রী রাম চন্দ্র রাক্ষস রাজ রাবন কে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সে কারণেই অষ্টমী নবমীর পূজা এত মহীমান্বিত। কুৎসিত জন্তুটা পালাতে পারছে না কিছুতেই– কিন্তু প্রাণপনে লড়ছে সে, বাঁচার জন্য। চারদিক থেকে শুয়োরটাকে আক্রমণ করছে মানুষ গুলো। জন্তুটার হিংস্র চেহারার মধ্যে লুকিয়ে আছে বাঁচার প্রবল আকুতি– কিন্তু চক্রবহুহ রচনা করেছে ক্ষুধার লালসা অন্ধ মানুষ গুলো। এ যেন মহাভারতের 'অভিমূন্য বধ' বাতাসে চিৎকার ভেসে আসেছে এখনো; ভট্টাচার্য মশায়ের আরতি হয়ে পড়ছে অন্তসার শূন্য; শুধুও নিয়ম রক্ষা; একাগ্র হতে পারছেন না পুরোহিত মশায় কিছুতেই। বার বার তার চোখে ভেসে আসছে রাগী আতংকিত এক ইতর প্রাণির মুখ, যে বাঁচতে চাই এই চক্রবুহ্যের আক্রমণ থেকে ....

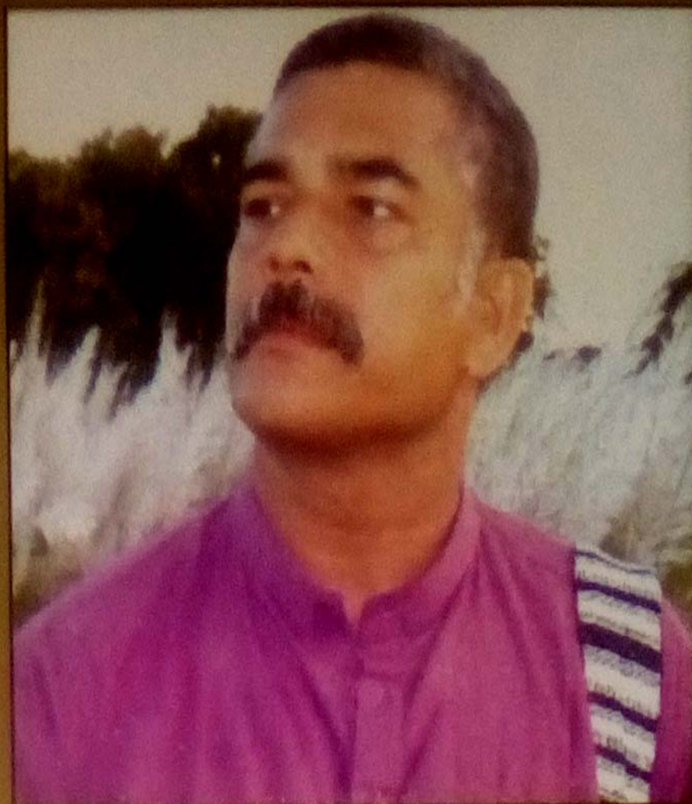

শাশ্বত নিপ্পন

পেশা : শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা,
সাংস্কৃতিককর্মী ও নাট্যকর্মী

জন্ম : মেহেরপুর, ১৮ মে ১৯৭০

পিতা : শিবনারায়ণ চক্রবর্তী

মাতা : মায়ারানী চক্রবর্তী

সন্তান : তন্ত্রী ও নীল

পূর্বপ্রকাশ : অনতিক্রম [গল্পগ্রন্থ ২০১৩]

প্রকাশিতব্য : নীলক্ষায় রক্তাক্ত প্রজাপতি কাব্যগ্রন্থ]